১৪ নভেম্বর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

খেলনামেলা

শিশুদিবস-সংখ্যা

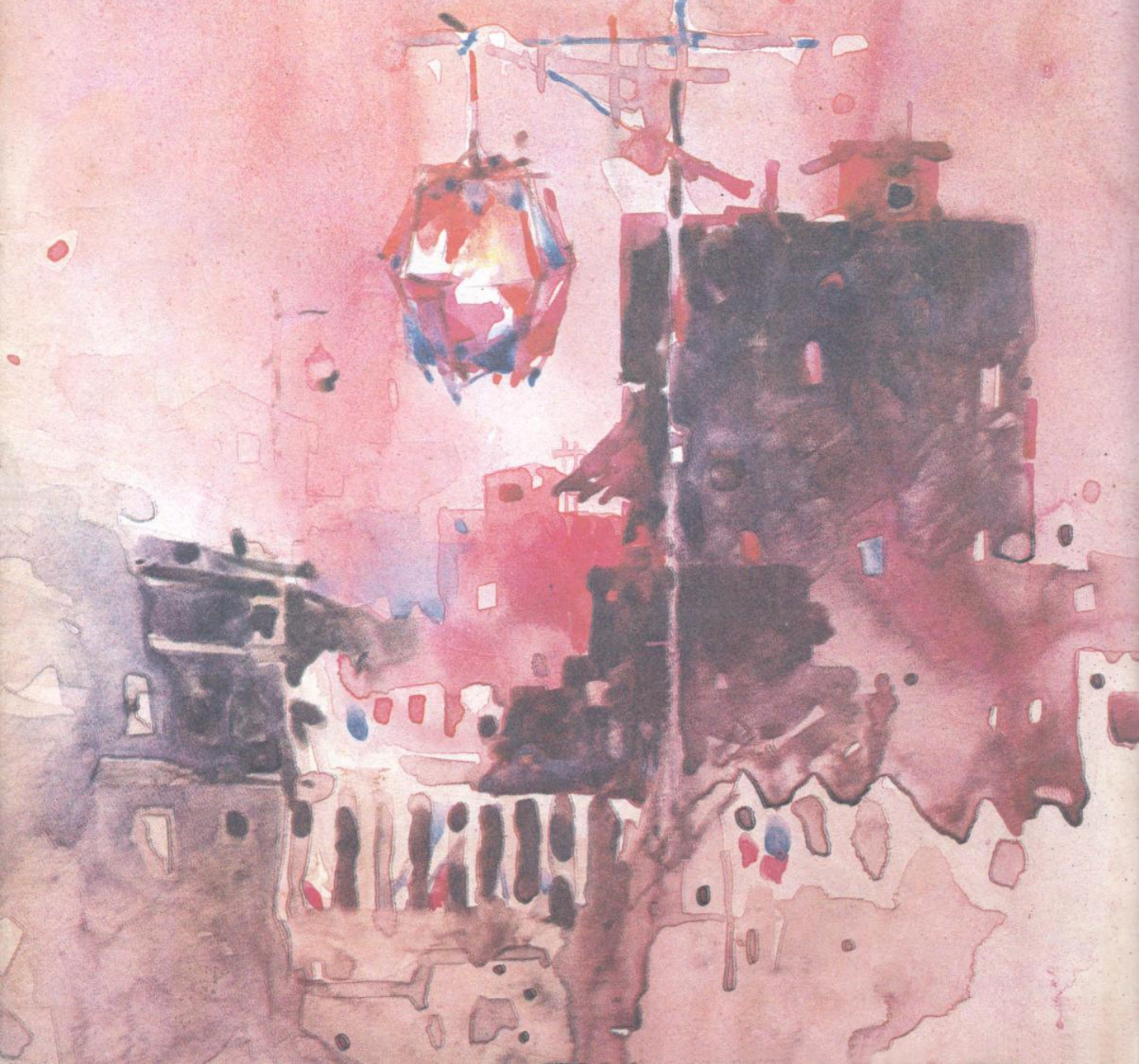

নতুন

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহারের

দুটি টিনের সঙ্গে!

নতুন ফ্যারেক্স বেশী সুস্বাদু
নতুন ফ্যারেক্স বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্যে উপকারী।

নির্বাচিত কয়েকটি শহরে, বিশেষ উপহারের টিনের ওপর
স্টক থাকা পর্যান্তই এসুযোগ পাওয়া যাবে।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/5/244 BEN

আনন্দমেলা

২৮ কার্তিক ১৩৯১ | ১৪ নভেম্বর ১৯৮৪ | ১০ বর্ষ ১০ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
নিশ্চিন্তপুরের রোমাঞ্চ। কঙ্কাবতী দত্ত ৩৪
গল্প
রুকু, সুকু ও পুসি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৫
কানা গুনিন। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ১৩
বিশেষ রচনা
কলকাতার পাতাল-রেল। সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত ৯
ছড়া
স্বজনভোজ। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮
চিড়িয়াখানায়। মৃণাল দত্ত ৮
মৈনাক বন্দ্যো। আনন্দ ঘোষ হাজরা ৩০
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
ইতিহাসের গল্প
নিকোলাও মানুচির গল্প। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ২৪
শার্লক হোমসের গল্পমালা
কমলালেবুর পাঁচটি বীজ। অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫১
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ১৯
জেনে নাও। অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৯
দুর্গাপুর গার্লস' হাইস্কুল। শ্যামলকান্তি দাশ ৫৮
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৫৯
ওলিম্পিকের আসরে
'ইণ্ডিয়াটা কোথায়'। সোমা দত্ত ৫৫
খেলাধুলো
এশিয়া কাপের শেষ পর্বে ভারত। অশোক রায় ৬৩
আম্পায়ারের খেলা। মণি শর্মা ৬৫
গাওস্করের একশো। সুব্রত সিংহ ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ৩২ ; মজার খেলা, উত্তর বটে, হাসিখুশি ৩৩
তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : সমীর মণ্ডল

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

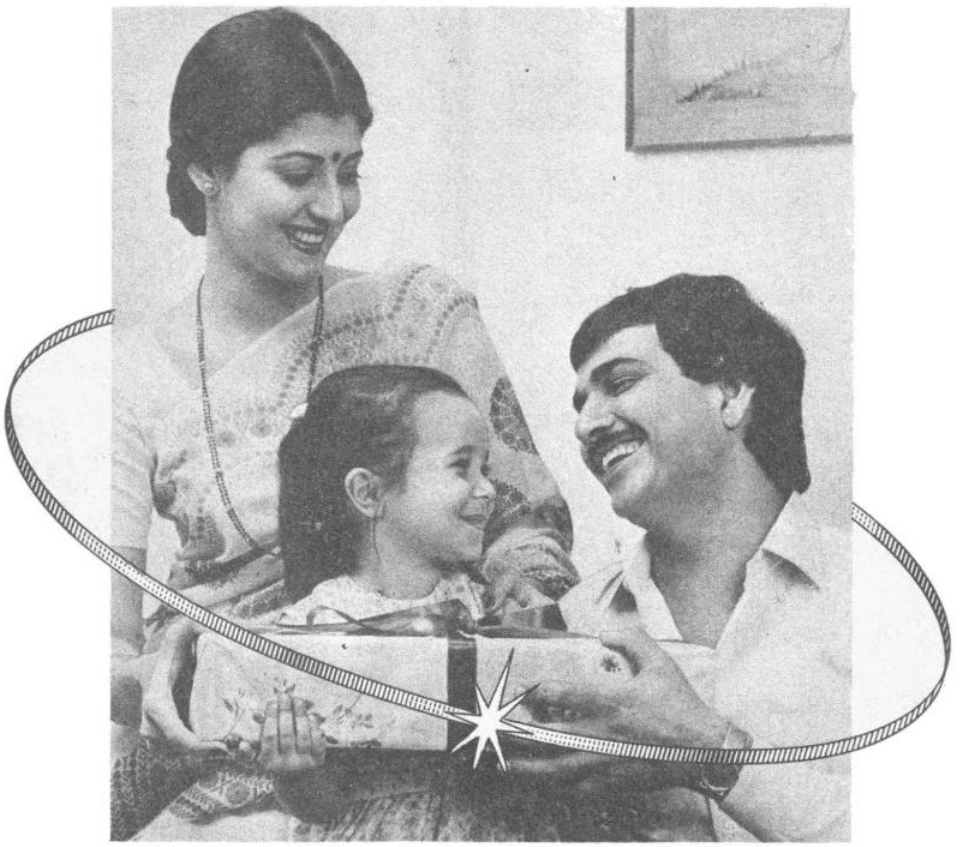

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিষ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

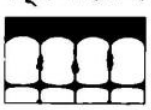

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

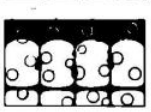

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবানু হ'তে দেয় না।

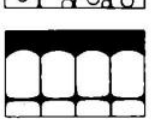

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

কি তাজা মিষ্টি স্বাদ!

GK&E.B84.55 Ben

রুকু, সুকু ও পুসি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। বাজছে তো বাজছেই। ভোরের হালকা বাতাস গম্ভীর শব্দে কাঁপছে। আকাশ থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যাচ্ছে। পাহাড়ের পাশ থেকে টক্ করে লাফিয়ে উঠল সূর্য। ডিমের কুসুমের মতো রঙ।

সুকুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘণ্টা তখনও বাজছে। জানলার সামনে ঝুলে থাকা কৃষ্ণচূড়ার ডালে সেই পাখিটা এসে বসেছে। সুকুর বন্ধু। রোজ সকালে পাখির কাজ গান গেয়ে সুকুর ঘুম ভাঙানো। কেউ বিশ্বাস করে না, পাখি আসে সুকুর ঘুম ভাঙাতে। সুকু বলেছিল, বেশ আমি যখন গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যাব, তখন দেখবে পাখি আর আসবে না। সত্যিই তাই। প্রমাণ পেয়ে অবিশ্বাসীদের এখন বিশ্বাস হয়েছে।

সুকু মশারির ভেতর থেকে তিনবার শিস দিয়ে জানাল, "পাখি, আমি উঠেছি।" পাখির ভাষা সুকু বোঝে, সুকুর ভাষা পাখি বোঝে।

সুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেছে। সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। একজনের জীবনমরণ সমস্যা। সামনের খাটে শুয়ে আছে রুকু। এখনও শীত পড়েনি। ভোরের দিকে অল্প শীত-শীত। মায়ের হাতে তৈরি কাঁথা গায়ে রুকু ভোঁস-ভোঁস ঘুমোচ্ছে। সন্দেহের কিছু নেই। তবু ভীষণ সন্দেহের। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয় যে, কাঁথা চাপা দিতে হবে। কাঁথার তলায় আশ্রয় পেয়েছে এক আসামি। নির্বাসনেই যার যাবার কথা। দু'ভাই কায়দা করে বাঁচিয়ে রেখেছে। মা ঘুম থেকে উঠে এ-ঘরে আসার আগেই আসামিকে সরাতে হবে নিরাপদ জায়গায়।

"দাদা। দাদা," সুকু চাপা গলায় দাদাকে ডাকল। রুকুর ঘুম সহজে ভাঙে না। ঘুমোতেও যেমন দেরি হয়, জাগতেও সেই রকম সময় নেয়। মা মাঝে-মাঝে বলেন, "কুম্ভকর্ণ রুকু হয়ে পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

"এই দাদা।" রুকুর মাথায় খোঁচা মারল সুকু।

"কী, কী।" রুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই বলতে লাগল, "কে, কে?"

"এই দাদা, ঠিকঠাক আছে তো?"

রুকুর খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছের চাপা ওঠাল। মৃদু একটা ঘড়ঘড় শব্দ কানে এল।

ঘুম-ঘুম চোখে রুকু ফিসফিস করে বললে, "আছে, আছে।"

সুকু ফিসফিস করে বললে, "চাপা দে, চাপা দে।"

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। মায়ের ওঠার সময় হল। রাজ্যেশ্বরী ঠিক পাঁচটার সময় ওঠেন। উঠেই ছেলেদের ঘরে আসেন। খুব ভাল গান গাইতে পারেন। বহু বড়-বড় আসরে এক সময় গান গেয়েছেন। রাজ্যেশ্বরী ভোরের সুরে আলাপ করতে-করতে আসেন। সেইটেই ভরসা। তিনি আসছেন, জানা যাবে।

কাল দুপুরে রাজ্যেশ্বরী এই বাচ্চাটার ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। সাদা ধবধবে, এতটুকু বেড়াল-বাচ্চা। এই বয়েসেই ন্যাজটা কী মোটা হয়েছে। ভারী মিষ্টি মুখ। বাচ্চাটা না জেনে কিছু অপরাধ করে ফেলেছিল। বিচার করলে অপরাধটা অবশ্য তেমন সামান্য নয়। বেড়ালের হয়ে রুকু আর সুকু ওকালতি করতে গিয়েছিল, "বেড়ালের কি বুদ্ধি আছে মা?"

"খুব আছে বাবা। দুষ্টু বুদ্ধিতে মাথাটি একেবারে ঠাসা।"

বাচ্চাটা না-জেনে, ভোগের পায়েসে মুখ দিয়ে ফেলেছিল। বেড়ালটার নড়া ধরে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন

রাজ্যেশ্বরী। ঘাসের মধ্যে, মনের দুঃখে থমকে বসে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। বসে থাকলেই পারত। মানুষ হলে তাই থাকত। আসলে বেড়াল তো। চট করে ভুলে যায়। গুটিগুটি আবার চলে এসেছিল রান্নাঘরের সামনে। বেশ বসে ছিল থেবড়ে। রাজ্যেশ্বরীও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন অপরাধ। বিশ্বাসও করেছিলেন বেড়ালটাকে। করেছিলেন বলেই লখিয়ার ডাকে উঠে চলে গিয়েছিলেন পেছনের বারান্দায়। ফিরে এসে দেখলেন, বাচ্চা একটা ভাজা মাছ নিয়ে খাবার ঘরে টেবিলের তলায় বসে মহানন্দে খাচ্ছে। এ-অপরাধও হয়তো ক্ষমা পেয়ে যেত, কিন্তু বাচ্চাটা রাজ্যেশ্বরীকে মেজাজ দেখিয়েছে। টেবিলের তলায় নিচু হয়ে যেই বলেছেন, 'কী রে, কী করছিস এখানে,' উত্তরে বাচ্চাটা ন্যাজ নাড়তে পারত। মিউ করে আদুরে একটা ডাক ছাড়তে পারত। তা না করে 'গোঁ' করেছে। একবার 'ফ্যাঁস'ও করেছে।

"আপদটাকে বিদায় করে দিয়ে আয়।"

ছেলেদের ওপর ভার পড়েছিল, দূরে বহু দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসবে। কোথায় ছাড়তে হবে তাও বলেছিলেন। "রেল কলোনির ডিসুজারা খুব বেড়াল-ভক্ত। চুপিচুপি তাদের দোরগোড়ায় বসিয়ে দিয়ে আসবি। আর পাঁচটা বেড়ালের সঙ্গে মিলেমিশে ভালই থাকবে।"

মায়ের সব আদেশই দু'ভাই পালন করে। এই আদেশটি তাদের মনঃপূত হয়নি। অনেক মাথা খাটিয়ে কাল থেকে এই আজ সকাল পর্যন্ত বাচ্চাটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আর সম্ভব নয়। মা ওঠার আগে আরও মাথা খাটিয়ে একটা কিছু করতে হবে।

সুকু বললে, "নে নে, ওঠ্ দাদা। মা আসার আগেই সরাতে হবে।"

"কোথায় সরাবি ভাই? আর তো পারা যায় না।"

"আমার মাথায় ভীষণ একটা প্ল্যান এসেছে।"

"কী প্ল্যান?"

"চার্চে, ফাদারের কাছে দিনের বেলায় থাকবে। রাতে থাকবে আমাদের কাছে।"

"ফাদার যদি দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেন।"

"তা পারেনই না। ফাদার কত দয়ালু! তোর মনে নেই? সেই সেবার ভুলো কুকুরের পা ভেঙে গেল। ফাদার নিজে হাতেপা টেনে ধরে একটা কাঠ বেঁধে প্লাস্টার করে দিলেন। সবাই কত ভয় দেখাল, কামড়ে দেবে। ফাদার গ্রাহ্যই করলেন না। এক মাস ধরে সেই কুকুরের সেবা করলেন। চ দাদা, চ। আর ভাবার সময় নেই।"

রাজ্যেশ্বরীর গান শোনা গেল। সুকু ছোঁ মেরে বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে জানলা টপকে বাগানে।

"দাদা, তুই কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্। মা ডাকলে তবে উঠিস।"

বেড়ালটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে সুকু দৌড়তে লাগল মাঠ পেরিয়ে চার্চের দিকে। সুন্দর সকাল। প্রথম শীতের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সুকু দৌড়চ্ছে। উল্টো দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন রেঞ্জারকাকু। রোজ সকালে দৌড়তে বেরোন। সুকুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, "চিয়ার আপ মাই বয়, চিয়ার আপ।"

বাচ্চাটা সুকুর বুকের গরমে ঘড়ঘড় করছে। বেড়ালদের এই এক মুশকিল, বিপদেও খুশি থাকে। বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে, তাও ঘড়ঘড়ানি গেল না। সুকু মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখছে। নরম তুলতুলে, ধবধবে সাদা। কাঠবেড়ালির মতো মোটা ন্যাজ, সুকুর পেটের কাছে ঝুলছে। সুকু মনে মনে বললে, বাচ্চা, তুই বাংলা জানলে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারতিস। বলতে পারতিস, মা, বেড়াল তো চুরি করেই খাবে মা, তুমি কেন চাপা দিয়ে রাখোনি। বেড়ালের কাজ বেড়াল করেছে! মানুষের কাজ মানুষ করেনি। দোষ কার মা? তোমার না আমার?

সুকু চার্চে ঢুকে পড়ল। এইবার শান্তি। চূড়া উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। মাথায় ঘণ্টাঘর। ওই ঘণ্টাটাই একটু আগে বাজছিল। সিমেন্ট-বাঁধানো পথ ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে সোজা চলে গেছে ফাদার যেখানে থাকেন সেই দিকে। গির্জার জানলার রঙ-বেরঙের কাঁচে সকালের রোদ হাসছে।

সুকু ডাকল, "ফাদার।"

ভেতর থেকে উত্তর এল, "ইয়েস, মাই সান।"

টেবিলে বসে ফাদার কী লিখছিলেন। চোখে আধখানা চশমা।

সুকুকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। ভোরের আকাশের মতো মুখ।

"সুকু! কী ব্যাপার! তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?"

"ফাদার, সেভ মাই ক্যাট।"

"ফ্রম র‍্যাটস?"

"না ফাদার, ফ্রম মাই মাদার।"

সুকু বেড়ালটাকে টেবিলে ছেড়ে দিল। মিউ করে বেড়ালটা একবার ডাকল। তারপর টেবিল থেকে লাফিয়ে ফাদারের কোলে।

ফাদার বললেন, "বাঃ, ভারী সুন্দর। কোথা থেকে পেলে মাই সান?"

"আমাদের বাড়িতে এসেছিল ফাদার। কেউ মনে হয় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ ফাদার। ও একটু অপরাধ করে ফেলায় মা ওকে দূর করে দিয়েছেন। প্লিজ সেভ হার।"

"কী অন্যায় করেছে সুকু?"

"একটু চুরি করেছে ফাদার। মা বলছেন চুরি। ঠিক চুরি নয়। নিজের ভেবে খেয়ে ফেলেছে।"

"আই সি।"

"ফাদার, একে আপনি আশ্রয় দিন। সকালে আপনার কাছে থাকবে। রাতে আমরা নিয়ে যাব।"

"ভেরি গুড।"

"ফাদার, ওর এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি।"

"আমারও হয়নি। আমরা দু'জনে শেয়ার করব।"

"ফাদার, ও একটু বেশি ঘুমোয়।"

"আমার বিছানা আছে।"

"ফাদার, ইউ আর গ্রেট।"

"সান, তুমি আমার চেয়েও গ্রেট।"

সুকু বাড়ি ফিরে এল। বেশ হাল্কা লাগছে এখন। রুকু মুখ

ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুচছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে ?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"নো প্রবলেম ?"

"নো প্রবলেম। মা কোথায় ?"

"চা করছেন।"

রান্নাঘর থেকে রাজ্যেশ্বরীর গলা ভেসে এল, "আয়, আয়, পুসি আয়, পুসি। চুকচুক।"

রুকু বললে, "পুসিকে কোথায় পাবে মা ? তাকে তো কাল তুমি দূর করে দিয়েছ।"

তবু রাজ্যেশ্বরী ডাকতে লাগলেন, "আয়, আয়, পুসু আয়, দুধ খেয়ে যা।"

সুকু রান্নাঘরের সামনে গিয়ে হাত-পা নেড়ে বললে, "বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ?"

"কিসের ছলে, তাই না ? রুকুর কাঁথার তলায় কে আছে ? যা, তুলে আন। কাল থেকে কিছু খায়নি। দুধ খাবে।"

"তুমি কী করে জানলে মা ?" সুকু আশ্চর্য হল।

"আমি যে ডিটেকটিভ বাবা। কাল রাতে তোরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিস, তখন তোদের ঘরে গিয়েছিলুম দেখতে।"

"কী দেখতে মা ?"

"রোজই আমি যাই বাবা হনুমান দেখতে। এক ঘরে দুটো হনুমান, কখন কী করে বসে ! গিয়েই সন্দেহ হল। কী ব্যাপার ! এই গরমে রুকু কাঁথামুড়ি দিয়েছে কেন ? গরমে ঘেমে নেয়ে যাবে। চাপা সরাতে গিয়ে কী দেখলুম বল্ তো। যা, তুলে আন। আহা, কাল থেকে কিছু খায়নি রে ! ভাগ্যিস কাল তোরা ডিসুজাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসিসনি !"

"মা, তুমি গ্রেট। কিন্তু মা, এই মাত্র তোমার ভয়ে পুসিকে যে চার্চের ফাদারের কাছে রেখে এলুম।"

"সে কী রে ! ফাদারের ওখানে একগাদা বিশাল-বিশাল কুকুর আছে যে রে !" রাজ্যেশ্বরীর হাত থেকে চামচে পড়ে গেল।

"কী হবে মা তাহলে ?"

"যা যা, এক্ষুনি নিয়ে আয়। কুকুরে একবার ঘাড় কামড়ে ধরলে মারা যাবে।"

"তুমি আর ওকে তাড়িয়ে দেবে না তো ?"

"শোন্, আমি মা তো ! আমার দু'রকম কথা। এক মুখের কথা, আর এক মনের কথা। যা যা, নিয়ে আয়।"

রুকু আর সুকু দৌড়ল গির্জার দিকে। রোদ বেশ চড়ে গেছে। গেটের কাছে যখন পৌঁছল, দু'জনেই বেশ ঘেমে গেছে। হাঁপাচ্ছে। দূরে একগাদা বইপত্র বগলে চেপে ধরে ফাদার হেঁটে চলেছেন অফিসের দিকে।

"ফাদার, ফাদার।"

দু'ভাইকে ছুটে আসতে দেখে ফাদার দাঁড়িয়ে পড়লেন, "ইয়েস মাই সান্স। আবার একটা বেড়াল ?"

"না ফাদার, পুসিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।"

"আই সি। আই সি। বেকসুর খালাস ?"

ফাদার হাসতে লাগলেন। ফর্সা মুখ। ঝকঝকে দাঁত। সাদা ধবধবে আলখাল্লা। বুকের কাছে দুলছে সোনালি ক্রস।

ফাদার ফিরে চললেন নিজের ঘরের দিকে। রুকু জিজ্ঞেস করলে, "কী করছে পুসি ?"

"আমার বিছানায় চুপটি করে ঘুমোচ্ছে। দুধ খেয়েছে। বিস্কুট খেয়েছে।"

ঘর খুললেন ফাদার। বিছানায় বেড়াল নেই। ঘরের কোথাও নেই। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নেই। খোঁজ খোঁজ। ফাদার বেরোচ্ছিলেন। মোপেডে চেপে পাশের একটা গ্রামে যাবেন। যাওয়া মাথায় উঠে গেল। বাগানে, কিচেনে, সর্বত্র খোঁজা হল। নো ক্যাট। আকাশের দিকে চোখ তুলে ফাদার প্রার্থনা করলেন, "ও গড, গিভ মি মাই ক্যাট।"

ফাদার বললেন, "দাঁড়াও, মাই ফ্রেণ্ড, ভুলো আমাকে সাহায্য করতে পারে কি না দেখি," বলেই ফাদার ডাকলেন, "ভুলো, ভুলো, কাম হিয়ার।"

পা-ভাঙা কুকুর, আগের মতো আর দৌড়তে পারে না। ঝোপের পাশ থেকে উঠে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সামনে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে।

"ভুলো, তুমি আমার পুসিকে দেখেছ ?"

ভুলো ন্যাজ নাড়ল।

"কোথায় দেখেছ ?"

ভুলো হাঁটতে লাগল। এপাশ-ওপাশ শোঁকে, আর গুটিগুটি হাঁটে। ভুলো গির্জার মাস-রুমে গিয়ে ঢুকল। সোজা পালপিটের সামনে। নানা রঙের কাঁচ চুঁইয়ে সূর্যের আলো নেমে এসেছে। আলোকের ঝরনাধারার মতো। রুকু, সুকু, বিশাল প্রেয়ার-রুমের আসনের তলায় পালপিটের ঘেরাটোপের আড়ালে নিচু হয়ে হয়ে দেখতে লাগল। তাদের সঙ্গে ফাদারও।

"হোয়্যার ইজ ইওর পুসি ?"

ভুলো হঠাৎ ওপর দিকে মুখ তুলে ঘেউ করে উঠল।

"কী হল ভুলো ?"

চার্চের দেয়ালে মেরিমাতার মূর্তি। বিশাল মূর্তি। হাসি-হাসি মুখ। কোল থেকে ঝুলে আছে সাদা একটি ন্যাজ।

সুকু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "ফাদার, পুসি মেরিমাতার কোলে উঠে বসে আছে। হাউ নাইস।"

"আয় পুসি, আয়, চুকচুক। আয় পুসি, আয়।"

কোল থেকে মুখ তুলে পুসি একবার ডাকল, মিউ। মায়ের কোল থেকে নামার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

সুকু দৌড়চ্ছে বাড়ির দিকে। "জোর খবর, জোর খবর !"

ছেলের চিৎকার শুনে মা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, "দেখবে চলো মা, দেখবে চলো। তোমার পুসি আর সে-পুসি নেই। মেরিমাতার কোলে উঠে, ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে মা। নামতে চাইছে না কিছুতেই।"

ছবি : দেবাশিস দেব

স্বজনভোজ

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভজনলাল ছ'জন তার স্বজনসাথী দ্বারা
পরিবৃত গেছল কাল গাজনতলা-মেলায়।
ডজন দুই মাছের চপ এক-একজনা তারা
ওজন ভুলে ভোজন করে ঠিক দুপুরবেলায়।
হাঁসের ডিম আইসক্রিম ছিল তাহার সাথে,
ভজনলাল খাওয়াল টাকা দিয়ে দরাজ হাতে।
বোশেখ মাস, প্রচণ্ড সে রোদ্দুরের তাতে
হাঁটতে হল মাইল ষোলো রাস্তা-যাতায়াতে
ফিরতে বাড়ি ; পথের মাঝে পেটের বেদনাতে
দু'জন শুয়ে পড়ল সেই গুরুভোজের ঠেলায়।
আপন দোষে তারা যে ভোগে, কে রাখে তার খোঁজ ?
দোষভাজন ভজনলাল বৈদ্য আনে রাতে
গাঁটের কড়ি খরচ করি' স্বজনে দিয়ে ভোজ।

ছবি : দেবাশিস দেব

চিড়িয়াখানায়

মৃণাল দত্ত

ওরেব্বাপ রে, ইয়াব্বড় যে হাঁ !
ছুঁড়িসনে তুই ঢেলা,
বদ্ধ জলায় হিপোপটেমাস
হাই তুলছে রে, রা
কাড়িসনে এই বেলা।

॥ ২ ॥
এবারে বরং ওই দিকে তুই চা !
হনুর ছোট্ট ছা
আঁকড়ে রয়েছে মা'কে দুই হাতে,
একটুও নড়ে না।
'হুপ' করে দ্যাখ্ লম্ফ দিয়েছে
বাচ্চা-হনুর মা।

॥ ৩ ॥
এক-পায়ে বক গাছতলায়
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঠায় ঝিমায়,
মস্ত সে ধার্মিক।
জানে না কিচ্ছু, সাত কি পাঁচ,
কিন্তু যখনই লাফায় মাছ,
বক ছোঁ মারবে ঠিক।

কলকাতার পাতাল-রেল

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

এ-বছরের ২৪ আগস্ট কলকাতার ২৯৪ বছর বয়স পূর্ণ হল। ১৬৯০ সালের এক ঘন বর্ষার রবিবারে ইংরেজ বণিক জোব চার্নক যখন তাঁর দলবল নিয়ে গঙ্গার ধারে সুতানুটি গ্রামে এসে নামলেন তখন কেউ ভাবতেও পারেনি কত বড় একটি ইতিহাসের সূচনা হল। দুঃসাহসী চার্নক বাসা বাঁধলেন সুতানুটিতে। এর লাগোয়া ছিল আরও দুটি গ্রাম—কলকাতা আর গোবিন্দপুর। চারদিকে ধানখেত, জঙ্গল, জলা, বুনো জন্তু-জানোয়ার আর অসুখ-বিসুখ। এই তিনটি গ্রামকে নিয়ে কলকাতার পত্তন করলেন জোব চার্নক। সভ্যতার ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজরা ধীরে-ধীরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ হল ইংরেজদের এক উপনিবেশ। ভারতবর্ষের রাজধানীর প্রথম মর্যাদা পেল কলকাতা, যদিও ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইংরেজের শাসনকালে এই শহর এক-এক করে বহু ইতিহাস রচনা করেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাই প্রতিনিয়ত কলকাতাকে স্মরণ না করে উপায় নেই। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার আলোকে দীপ্ত এই শহর সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই হয়ে উঠল সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র। নবজাগরণের ধারাকে অকৃপণভাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিল কলকাতা। কলকাতার থেকে প্রাচীন শহর পৃথিবীতে অনেক আছে, তাদের ইতিহাসও যথেষ্ট ঘটনাবহুল। কিন্তু ভারতীয় জীবনে কলকাতার মতো ছাপ অন্য কোনো শহর বোধহয় রাখতে পারেনি। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের মিলনের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এই শহরেই, তাঁর জীবনের অমূল্য সৃষ্টিশীল বেশ কয়েকটি বছর কেটেছে এই শহরের বাইরে, কিন্তু মৃত্যুক্ষণে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন কলকাতাতেই। বাংলা-ভাষাভাষী সব মানুষের সঙ্গেই এই শহরের একটা আত্মিক টান আছে। অল্প কয়েকদিনের জন্য এই শহর ছেড়ে গেলেই বোঝা যায় কলকাতার টান। এই ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত। প্যারিসের জন্য ফরাসিদের, লণ্ডনের জন্য ইংরেজদের যেমন তীব্র ভালবাসা, ঠিক তেমনি ভালবাসা আছে কলকাতার জন্য বাঙালিদের।

কিন্তু শুধুমাত্র ভালবাসাকে ভিত্তি করেই একটা শহর বেঁচে থাকতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত পরিচর্যার। স্বীকার করতেই হবে, দীর্ঘ এক ঔদাসীন্যের ফলে বিরাট অবক্ষয় ক্রমশ কলকাতাকে গ্রাস করে ফেলছে। কলকাতাকে কেউ যদি 'মৃত নগরী' বলে তবে তা আমাদের অভিমানে লাগে ঠিকই, কিন্তু কলকাতার দিকে চাইলে সত্যিই মনে হবে আমাদের এই অভিমান মিথ্যা। শহরের চারদিকে জঞ্জালের পাহাড়, বর্ষায় রাজপথে প্লাবন, ট্রামে-বাসে

[illegible] নির্মাণের কাজ চলছে

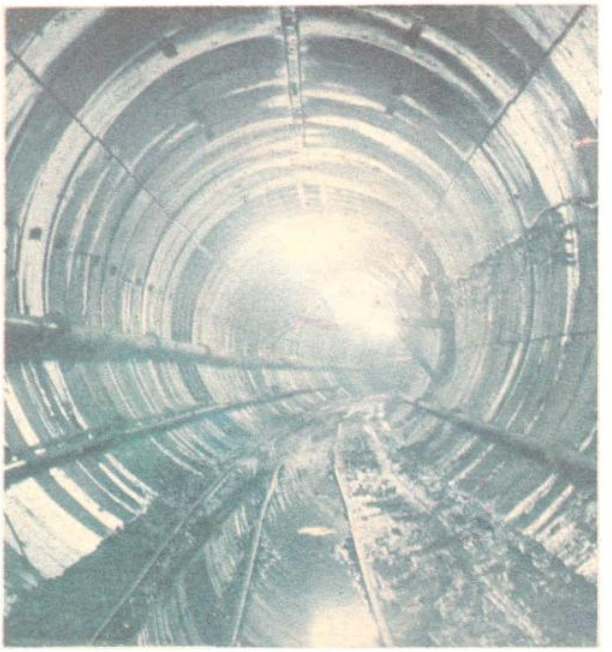

প্রতিদিনের [illegible] কষ্ট, ফুটপাথে হকারদের ভিড় ! কোথায় গেলে একটু [illegible] স্বস্তি পাওয়া যাবে ! আশি লক্ষ মানুষের বাস এই শহরে নাগরিকজীবনের সামান্য সুবিধাগুলিও এখানে উধাও।

একজন জননায়কই শুধু অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে গিয়েছেন এই ভাঙনকে ঠেকিয়ে কলকাতাকে সুন্দর করে সাজাতে। তিনি হলেন বাংলার প্রবাদপুরুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি বুঝেছিলেন সুদূরপ্রসারী নগর-পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। কলকাতার জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্যে তিনি তৈরি করেছিলেন নানা উপনগরী, সল্ট লেক, কল্যাণী ইত্যাদি। সরকারি পরিবহণ-সংস্থা তিনিই গড়ে তোলেন। কলকাতার সার্বিক উন্নতির জন্য তৈরি করেন সি· এম· পি· ও· (ক্যালকাটা

দমদম টানেল থেকে বেরিয়ে আসছে পাতাল-রেলের গাড়ি

পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে মেট্রো-ট্রেন

মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন)। এই শহরের যানবাহন সমস্যা সমাধান করার জন্য চক্ররেল ও পাতাল-রেল তৈরির কথা ডাঃ বিধানচন্দ্রই প্রথম ভেবেছিলেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার উন্নতির বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি বাক্সবন্দী হয়ে ছিল। কোনো পরিকল্পনা যে উদ্যম বা নেতৃত্বের অভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে না, কলকাতার দুরবস্থা আমাদের সে-কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়। অথচ দুর্বার প্রেরণা যদি থাকে তবে অসম্ভবকেও বাস্তবায়িত করা যে সম্ভব, তার প্রমাণ আজকের চক্ররেল। বাঙালি রেলমন্ত্রী ডাঃ রায়ের স্বপ্ন চক্ররেলকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চালু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, করলেনও তাই।

গত ১৬ আগস্ট গনি খান চৌধুরী বাগবাজার থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত চক্ররেল চালিয়ে বিধানচন্দ্রের স্বপ্নকে সার্থক করলেন। কলকাতার পাতাল-রেল নিয়েও অনেকে অবিশ্বাসের হাসি হাসেন, কিন্তু পাতাল-রেল পরিকল্পনার ইতিহাস, তার বাধা-বিপত্তি এবং বর্তমান কর্মধারার যদি আমরা সঠিক বিশ্লেষণ করি তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব যে, এই দশকেই পাতাল-রেল দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত অবশ্যই চলবে। যে দৃঢ় মানসিকতা ছ-মাসের মধ্যে চক্ররেলকে কলকাতায় চালু করেছে, সেই শক্তিই পাতাল-রেল চলাচলকে সম্ভব করে তুলবে।

কেন পাতাল-রেল ?

জনসংখ্যার দিক দিয়ে কলকাতা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর নগরী। এশিয়াতে সাংহাই ও টোকিওর পরেই তার স্থান। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা এত খারাপ যে, শহরের প্রায় আশি ভাগ যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে না। কলকাতার প্রধান সমস্যাই হল যানবাহন-সমস্যা। গাড়ি-ঘোড়া বাড়িয়েও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কলকাতার মোট জমির শতকরা ছ'ভাগ মাত্র রাখা হয়েছে রাস্তাঘাটের জন্য। অথচ, দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই কিংবা জয়পুরেও রাস্তাঘাটের জন্য জমি নির্দিষ্ট আছে শতকরা কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগ।

যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে রাস্তা বানাতে গেলে বহু ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়, যা নানা কারণেই সম্ভব নয়। তবে কি এইভাবে দিনের পর দিন কলকাতার মানুষ এই পরিবহণ-সংকটে হাবুডুবু খাবে ? এই প্রশ্ন ছিল পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের। ১৯৪৯ সালে তিনি কলকাতায় ডেকে আনলেন একদল ফরাসি পাতাল-রেল বিশারদকে। তাঁরা জানালেন যে, বিশেষ এক পদ্ধতিতে কলকাতায় পাতাল-রেল তৈরি করা সম্ভব। ডাঃ রায় তখন অবশ্য পাতাল-রেল তৈরির কাজে হাত লাগাতে পারেননি।

তখন বাংলা দেশ সদ্য ভাগ হয়েছে। স্রোতের মতো উদ্বাস্তু আসছে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে তখন এক টালমাটাল অবস্থা। পাতাল-রেল প্রকল্প অর্থের অনটনে কার্যকর হল না। কালক্রমে শহরের পরিবহণ সমস্যা ভয়াবহ হয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় সরকারও এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৬৯ সালে প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশে সমীক্ষক দল সবকিছু সরেজমিনে বিচার করলেন। তাঁরা জানালেন যে, পাতাল-রেলই পরিবহণ সংকট থেকে একমাত্র উদ্ধারের পথ। তাঁরা তিনটি পাতাল-রেল নির্মাণের সুপারিশ করেছিলেন। একটি পথ তৈরি হবে কলকাতার উত্তর-প্রান্ত দমদম থেকে দক্ষিণের টালিগঞ্জ পর্যন্ত। অন্য দুটি সল্ট লেক থেকে গঙ্গার নীচে দিয়ে গিয়ে হাওড়ার রামরাজাতলা (১৭কি মি) এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরপুকুর (২৬·৭কি মি) পর্যন্ত।

প্রাথমিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত হল দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ১৬·৪৩ কিলোমিটার পাতালপথটি তৈরি করা। এই পাতালপথের মধ্যে থাকবে সতেরোটি স্টেশন—দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরিশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধি রোড, বৌবাজার, চাঁদনি, এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, ভবানীপুর, হাজরা, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর এবং টালিগঞ্জ। প্রতিটি স্টেশনের দূরত্ব এক কিলোমিটারের মধ্যে। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে কলকাতাই পাবে সর্বাধুনিক দ্রুততম জনযান ব্যবস্থা। আধুনিক নাগরিক পরিবহণ ব্যবস্থায় পাতাল রেলকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যে-সব শহরে জনসংখ্যা দশ লাখের ওপর সেখানে পাতাল-রেলই প্রকৃষ্টতম, তা আজ সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। পৃথিবীর ৭৭টি শহরে বর্তমানে পাতাল-রেল চালু রয়েছে, আরও বাইশটিতে নির্মাণের কাজ চলছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ শহরেরই জনসংখ্যা কলকাতার থেকে অনেক কম।

কাজের পথে নানা বাধা, তবু

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাতাল-রেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৩-এ দমদম ও ময়দানে কাজ শুরু হয়। হঠাৎ নেমে এল এক অনিশ্চয়তা। তখন শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা দুনিয়া জুড়ে। পাতাল-রেল প্রকল্পেও তার ধাক্কা লাগল। কেন্দ্র থেকে পাতাল-রেল প্রকল্পে যে অর্থসাহায্য আসত, সেখানে অনটন। কাজের গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে এল। সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের মধ্যে তখন এক দারুণ হতাশা। ১৯৭৮ সালে ঘটনা স্বাভাবিক হলে দিল্লি থেকে এই খাতে টাকা আসতে শুরু করল আবার। সঠিক অর্থে কাজ শুরু হল ওই বছর থেকেই। ১৯৮০ সালে জোর কদমে কাজ শুরু হল। ১৯৮২ সালে এল

নতুন গতিবেগ। পাতাল-রেলের কাজ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চললে তা যে কলকাতার মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েই তুলবে, বাঙালি রেলমন্ত্রী এ কথা সঠিকভাবেই বুঝলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই কাজের তদারকি শুরু করলেন রেলমন্ত্রী হবার পর থেকেই। ঠিক হল পাতাল-রেলপথ যতটুকু তৈরি হয়েছে, তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এর ফলে কলকাতার মানুষের দীর্ঘ হতাশার অবসান হবে, আর মনোবল বাড়বে পাতাল-রেল কর্মীদের। ঠিক হয়েছে, প্রারম্ভিকভাবে দমদম-বেলগাছিয়া এবং এসপ্লানেড-ভবানীপুর চত্বর জুড়ে খুব তাড়াতাড়ি মাটির নীচের রেল চালানো হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাথমিক পর্যায়ে আংশিক ভাবে পাতাল রেল চালিয়ে ধীরে ধীরে তাকে সম্প্রসারিত করা হয়। বিদেশী পাতাল-রেল বিশেষজ্ঞরাও এইভাবে কলকাতায় পাতাল-রেল চালানোর পক্ষপাতী।

কলকাতার পাতাল-রেল তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে এঁদের প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের মতো বড়-বড় ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষেও কলকাতায় পাতাল-রেলপথ তৈরি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কলকাতার রাস্তাঘাট একেই অত্যন্ত ছোট, তার ওপর আছে হাজারো গাড়িঘোড়ার চাপ। মানুষের যাতায়াতের পথ খুলে রেখে নির্মাণের কাজ চালাতে হচ্ছে। মাটির তলায় আবার আছে জলের পাইপ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের তার, অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী। সব কিছু ঠিকঠাক রেখেই কাজ চালাতে হবে। একটারও এদিক-ওদিক হলে নানা ঝামেলা দেখা দেবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু এত ঝক্কি পোয়াতে হয় না। কলকাতার মাটিও অত্যন্ত নরম। এইসব কারণে কাজের গতি মন্থর হতে বাধ্য। তাছাড়া আছে অতিবৃষ্টি। বর্ষায় কাজ তো প্রায় বন্ধই থাকে। কলকাতায় জল-নিষ্কাশনের ড্রেনগুলির বেশির ভাগই অকেজো। ফলে, রাস্তার জমা জল পাতাল-রেলের সুড়ঙ্গে ঢুকে গিয়েছিল।

চেষ্টা চলছে খুব তাড়াতাড়ি পাতাল-রেল চালাবার। পাতাল-রেল পুরোপুরি আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের হাতে তৈরি হচ্ছে। সফল হলে তাঁরা সারা দেশের বাহবা পাবেন।

পাতাল-রেলের বৈশিষ্ট্য

দমদম থেকে টালিগঞ্জ—এই প্রায় সতেরো কিলোমিটার পথটুকু পাতাল-রেল পাড়ি দেবে তেত্রিশ মিনিটে। আটটা কামরা নিয়ে হবে একটা ট্রেন। প্রতি বগিতে প্রায় তিনশো যাত্রীর জায়গা থাকবে। প্রতি ট্রেনে প্রায় আড়াই হাজার যাত্রী যেতে পারবেন। দেড় মিনিট অন্তর আপ ও ডাউন—দুটো লাইনে ট্রেন চলবে। ট্রেন চলবে ঘন্টায় ত্রিশ কিলোমিটার বেগে। দুটি স্টেশন ছাড়া সবকটিই থাকবে মাটির তলায়। স্টেশনে ঢোকবার-বেরোবার জন্য অনেকগুলো সাবওয়ে থাকবে। যাত্রীরা প্রথমেই আসবেন স্টেশনের দোতলায়। সেখান থেকে টিকিট কেটে নামতে হবে নীচের প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনের ভাড়া হবে একরকম, কেননা পাতাল-রেলে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ থাকবে না।

পাতাল-রেলের দরজাগুলো ট্রেন ছাড়ার আগে আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন

মেট্রো-ট্রেনে চড়ে ঘুরছে একদল ছাত্রছাত্রী

ছাড়বেই না। এমন আধুনিক আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে ট্রেন চালানো হবে যে, পাতাল-রেলে দুর্ঘটনার কোনো আশঙ্কাই নেই। ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাকে উন্নততর করা হবে।

কলকাতায় এমনিতেই দারুণ গরম। অনেকেই ভাবছেন, পাতালে না জানি কী গরমটাই হবে। কিন্তু তা হবে না। এমন ব্যবস্থা পাতাল-রেলে থাকবে যাতে ভিতরকার আবহাওয়া সুখকর হয়। ভিতরের গরম হাওয়াকে টেনে বের করে সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

পাতাল-রেলে লোডশেডিং হলে কী হবে? ট্রেন তো চলবে বিদ্যুতেই —এ প্রশ্ন অনেকেই করেন। পাতাল-রেলের ক্ষেত্রে নাকি সে-আশঙ্কা নেই। এই রেল চালু রাখতে ৫৩ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। এই বিদ্যুৎটুকু দেওয়া হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এই অগ্রাধিকারের তালিকায় দেশরক্ষা বিভাগের পরেই পাতালরেলের স্থান। দৈবাৎ যদি লোডশেডিং হয়, যার আশঙ্কা নিতান্তই কম, তাহলে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা কর্তৃপক্ষ ভেবে রেখেছেন।

বাসে-ট্রামে চলতে গিয়ে কলকাতার মানুষের কষ্টের সীমা নেই। পাতাল-রেল এই কষ্টকে অনেকখানি লাঘব করবে, সবাই বেশ আরামে স্কুল-কলেজ, কাজের জায়গায় যেতে পারবেন। আংশিকভাবে হলেও কয়েক বছরের মধ্যে পাতাল-রেল কলকাতায় চলছে—তোমরা তা জানো। আমরা চাই, কলকাতার বুকে পাতাল-রেল গতির ডানা জুড়ে দিক।

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

কানা গুনিন

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

লোকটার আসল নাম কেউ জানে না, সবাই বলে কানা গুনিন। সে এই এলাকায় তার ডেরা বেঁধেছিল। লোকটা আগে সাপের ওঝা ছিল, সাপ কামড়ালে বিষ নামিয়ে সে নাকি রোগীকে বাঁচাতে পারত। বিরাট চেহারা, প্রায় ছ' ফুট দীর্ঘ। সাদা ধবধবে দাড়ি আর মাথা-ভর্তি পাকা লম্বা চুল।

তার নাম কানা গুনিন হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, একটা চোখ কানা। কোনো দুর্ঘটনায় চোখটা নষ্ট হয়ে যায়। শোনা যায়, রয়াল বেঙ্গল টাইগারকেও সে ডরায় না।

লোকে ভয় পেত কানা গুনিনকে। ভয় পাওয়ার কারণ অবশ্য অন্য। ওঝার রূপটা নাকি ছদ্মবেশ, আসলে সে একজন 'বর্ন ক্রিমিনাল', অর্থাৎ জন্ম-অপরাধী। সুন্দরবনের কাছাকাছি এই এলাকায় ডাকাতি আর খুনজখম আকছার লেগেই থাকে। আর এর অনেকগুলোই কানা গুনিনের কাণ্ড বলে পুলিশের সন্দেহ। অথচ তার দল বলে কিছু নেই, সে একাই একশো।

কানা গুনিন আজ বেশ কিছুকাল নিরুদ্দেশ। পয়সাওয়ালা এক চাষি-গেরস্তকে খুনের দায়ে পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এমন একটা সময়েই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসে পড়লাম। সুন্দরবনের এলাকা এখান থেকে দূরে নয়। কয়েক মাইলের মধ্যেই ব্যাঘ্র-প্রকল্প। প্রায়ই খবর আসে, মউসন্ধানী কেউ-কেউ বাঘের হাতে মারা পড়েছে। তবু এ-সব খবরে মধু সংগ্রহে ভাটা পড়ে না। আরও একটা সমস্যায় বিব্রত থাকতে হয়। সেটা হল চোরাই গাছ কাটা। শাল, গরান, সুঁদরি, এ-রকম অজস্র গাছ এখানে। নৌকোয় ডাকাতিও লেগেই আছে। আর অসংখ্য নদীনালা তো আছেই পালানোর জন্য।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু জায়গাটা আমার ভাল লেগে গেল। বেশিদিন অবশ্য আমার এখানে থাকার কথা নয়। আমি শহুরে ছেলে হলেও জঙ্গলে কম ঘুরিনি। বলতে গেলে জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। একটু একটু শিকারও যে করিনি, তাও নয়। আমার নিজের একটা রাইফেলও আছে, তা দিয়ে বাঘ শিকারও করা যায়। তবে বাঘকে না মেরে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখতেই আমার আনন্দ।

এখানে এসে সহকারী হিসেবে পেলাম স্থানীয় এক যুবক সুধন্য মাজিকে। ছেলেটি খুব চৌকস। বেশ সপ্রতিভ আর সাহসী। সুন্দরবনের অনেক রহস্যই ওর নখদর্পণে।

কথায় কথায় সে-ই আমাকে কানা গুনিনের বর্ণনা দিয়ে তার পুরো জীবনীটাই একরকম শুনিয়ে দিল

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন :

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম

বেবি সিরিয়াল

দুধের সঙ্গে মেশান

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন।

নেস্টাম মিশিয়ে নিন।

এবার খেতে দিন।

NESTLÉ.

SAA/FSL/N/3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

যেখানে আমরা আছি সেটা বর্ধিষ্ণু একটা গ্রাম, প্রায় আধা শহর বলা যায়। দু' কামরার একটা বাড়িও পেয়ে গেলাম। এখানে মাছ ভালই মেলে। অতএব আর চাই কী ?

প্রথম দিনটা কাজকর্ম বুঝে নিতেই কেটে গেল। এলাকাটা ভাল করে দেখে নিলাম। অনেকের সঙ্গে আলাপও হল। সরকারি কাজে এসেছি বলে অনেকেই খাতির করতে শুরু করল।

সন্ধেবেলা বারান্দায় বসে সুধন্যর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

"স্যার, আপনাকে একটা কথা বলিনি," সুধন্য বলল। "কানা গুনিন আবার ফিরে এসেছে।"

বললাম, "তাই নাকি ? কী করে জানলে ?"

"গত পরশু ক' মাইল দূরের এক গ্রামে একজন খুন হয়েছে, স্যার। দু'একজন গ্রামবাসী চকিতে কানা গুনিনকে দেখতে পায়। সেই কালো পোশাক পরা, আগের মতোই চেহারা।"

"তাহলে তো ভাবনারই কথা !"

"হ্যাঁ, স্যার, লোকটা সত্যিই ভয়ঙ্কর।"

দিন-সাতেক কেটে গেল এমনি করেই। এরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করল যে, কানা গুনিনের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেলাম।

সারা এলাকায় কানা গুনিনের ভয় কেটে গিয়ে জন্ম নিল অন্য এক ভয়ানক ভয়। একটা ম্যানইটার অর্থাৎ মানুষখেকো রয়াল বেঙ্গল টাইগার এসে সারা এলাকাটাতে ত্রাসের সৃষ্টি করল।

ইতিমধ্যেই বাঘটার আক্রমণে কয়েকজন জেলে আর মউ-সংগ্রহকারী মারা গড়েছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হল, বাঘটা সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে আশপাশের গ্রামে অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। গ্রামের পথ থেকে, পরিপূর্ণ দিনর আলোয়, একজন গ্রামবাসীকে সে তার সঙ্গীদের প্রায় চোখের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে গেল।

ব্যাপারটা সরকারি দপ্তরকেও ভাবনায় ফেলে দিল। বাঘটা যে কোনো রহস্যময় কারণে সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে এসেছে তাতে সন্দেহ ছিল না। সরকারি দপ্তরে ভাবনা জাগল, বাঘটাকে শেষ পর্যন্ত নরখাদক ঘোষণা করতে হবে কি না।

এর চেয়েও ভয়ানক কিছু জন্ম নিল অন্যভাবে। সেটা হল অন্ধ কিছু সংস্কার। যে-গ্রামবাসীকে গ্রামের পথ থেকে বাঘটা তুলে নিয়ে যায়, তার সঙ্গীরা লক্ষ করেছিল, বাঘটার এক চোখ কানা।

অদ্ভুত একটা কাহিনী জন্ম নিল এর থেকে। গ্রামের কিছু সরল মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস জাগল, বাঘটা মায়াবী, কানা গুনিনই মন্ত্রবলে বাঘের রূপ ধরে অত্যাচার করে চলেছে। এ-বাঘকে কেউ মারতে পারবে না।

এরকম অবান্তর অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটা যে অসম্ভব, কাউকে কোনোভাবেই তা বোঝানো গেল না। অবস্থাটা এমনই দাঁড়াল যে, বাঘটার অত্যাচার যত বাড়তে লাগল, অন্ধ বিশ্বাসও ততই জোরালো হল। লোকে বাঘটাকেই কানা গুনিন বলে উল্লেখ করতেও শুরু করে দিল।

ক'মাসের মধ্যে পরপর বেশ-কিছু মানুষ বাঘটার হাতে মারা পড়ায় সরকারও চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না।

প্রথমে ঠিক হল, ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে বাঘটাকে ধরার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু বাঘটা জাদুবলেই যেন কথাটা জানতে পেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ছায়াও দেখতে পেল না শিকারিরা। তাকে ফাঁদ পেতে ধরার চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়েই বাঘটাকে নরখাদক ঘোষণা করে তাকে মারার জন্য শিকারিদের আমন্ত্রণ জানানো হল। কিন্তু সে-চেষ্টাও হল ব্যর্থ। তিন মাসের মধ্যে বাঘটাকে কেউ দেখতেই পেল না। আশ্চর্যের কথা, এই সময়ের মধ্যে কানা গুনিনের কথাও কেউ শোনেনি।

বাঘটাকে মারার তৎপরতায় ভাটা পড়তেই আবার একজন মউ-সংগ্রহকারী মারা পড়ল তার হাতে। পুরনো সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো আবার ফিরে এল এলাকাটায়।

অবস্থা দেখে আমার মনও চঞ্চল হয়ে উঠল। আমার ঘুমিয়ে থাকা শিকারি-সত্তা আমাকে অনবরত খোঁচাতে শুরু করে দিল, বাঘটাকে একবার শিকারের চেষ্টা করলে দোষ কী ?

কথাটা শুনেই তীব্র আপত্তি জানাল সুধন্য।

"না, স্যার, এরকম ঝুঁকি নেবেন না। তা ছাড়া সুন্দরবনের বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা আপনার নেই।"

কিন্তু আমার কেমন জেদ চেপে গেল, একবার চেষ্টা করে দেখবই।

সরকারি অনুমতি মিলতে দেরি হল না। খবর পেলাম, বাঘটা তিন দিন আগে মাইল পাঁচেক দূরের একটা গ্রামে একজনকে মেরেছে। এখন পর্যন্ত এটাই তার শেষ শিকার।

আমার রাইফেলটা এবার সাফ করে নিলাম। পরদিন দুপুরের দিকে সুধন্যকে নিয়ে পৌঁছলাম সেই গ্রামে।

দূরে-দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কিছু মাটির ঘর। গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে টের পেলাম যে, একটা চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে তাদের মনে। আমার সাফল্য নিয়েও যে তাদের সন্দেহ আছে, সেটাও তারা প্রকাশ্যেই বলে ফেলল।

বাঘটা শেষ যেখানে শিকার করেছে, সে-জায়গাটা গ্রামের প্রান্তে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম একটা মেটে বাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পাশেই জঙ্গল।

শুনতে পেলাম বাঘটা গত ক'মাসে ঠিক এখানেই তিনজন মানুষ মেরেছে। বাঘটা যে এখানে ঘোরাফেরা করে, তা বুঝে এখান থেকেই শিকারের চেষ্টা করব ঠিক করলাম।

চারপাশে বড় বড় গাছের অভাব নেই। তারই একটায় মাচান বাঁধা হল।

সুধন্যর খুবই আপত্তি ছিল কাজটায়। এই ঝুঁকি নেওয়াটা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তবুও আমার চাপে পড়েই ও টোপ হিসেবে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগল বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করল।

সব ব্যবস্থা করতে বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এল। সুধন্যকে গ্রামেরই একজনের আশ্রয়ে পাঠিয়ে সন্ধ্যার আগেই মাচানে আশ্রয় নিলাম আমি। সঙ্গে রইল আমার রাইফেল, জলের ফ্লাস্ক আর তিন সেলের একটা টর্চ।

আস্তে-আস্তে অন্ধকার নামতে শুরু করল। শুরু হল আমারও প্রতীক্ষা। বাঘটা আসবে কি না জানি না, এলেও তাকে মারার কোনো সুযোগ পাব কি না তাও আমার অজানা। যেখানে দক্ষ সব শিকারি ব্যর্থ, সেখানে আমার সুযোগ কতখানি তাও জানা নেই।

নানা কথা আমার মনে খেলে গেল। কেন জানি না ঘুরে ফিরে কানা গুনিনের কথাটাই বেশি করে মনে পড়ল।

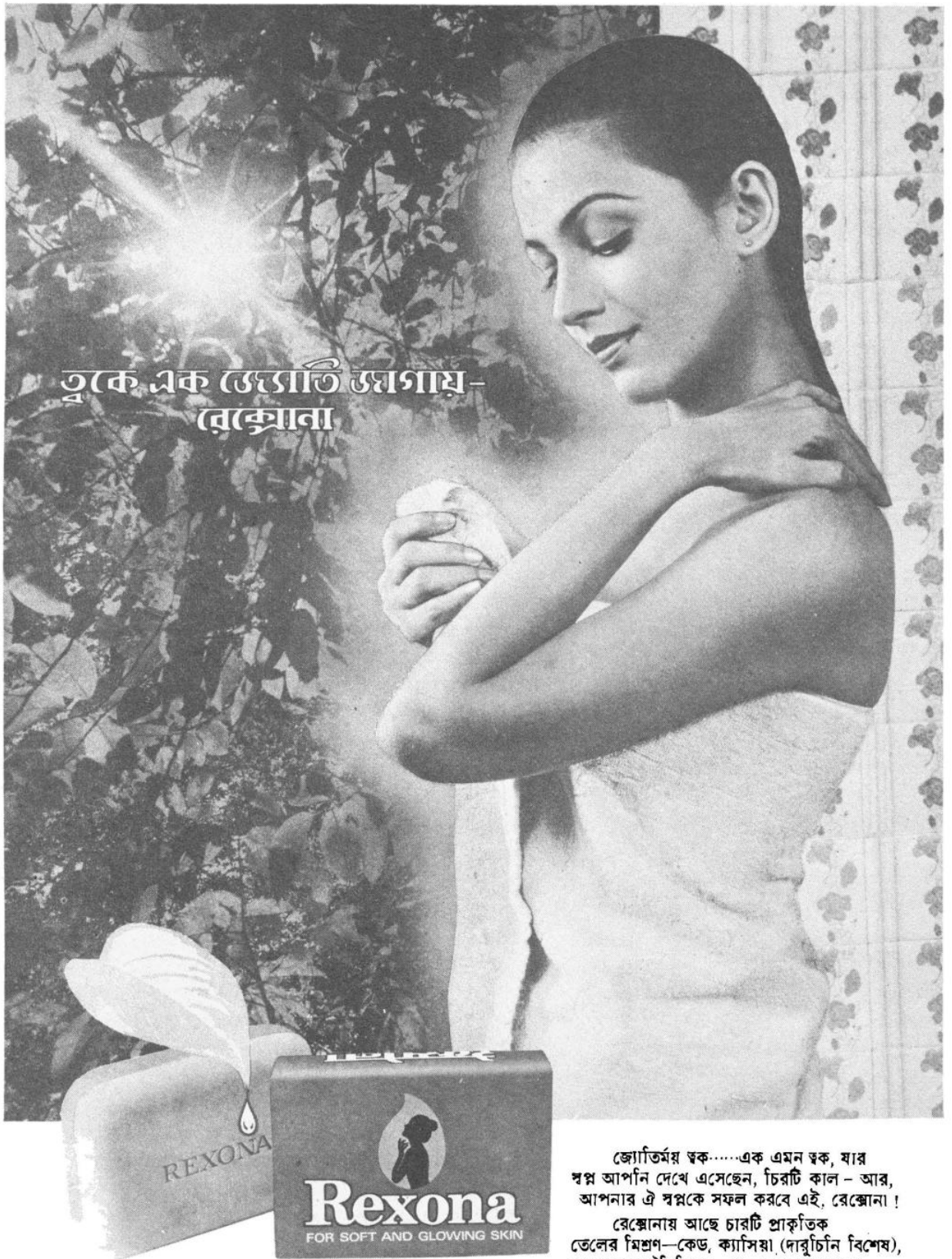

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

একটু-একটু করে রাত বাড়ছে। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িতে দেখলাম রাত দশটা। শুক্লপক্ষের রাত। চারদিকে হাল্কা চাঁদের আলো কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

রাত আরও একটু গভীর হল। খুঁটিতে বেঁধে রাখা ছাগলটাই মাঝে-মাঝে ডেকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলেছে। আমার মাচান থেকে কিছু দূরে কবরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আচমকা একফালি মেঘে চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেলে অস্পষ্ট অন্ধকার নেমে এল।

একটু পরেই মেঘ সরে যেতে যা দেখলাম, তাতে অজান্তেই আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল।

একটা দীর্ঘ মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পোড়ো ভিটের সামনে। সারা দেহে তার কালো পোশাক। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তার মাথার সাদা চুল আর দীর্ঘ সাদা দাড়ি বাতাসে উড়ছে।

কানা গুনিন।

কিন্তু এ অসম্ভব। যেখানে মানুষখেকো বাঘের আনাগোনা, সেই ভয়ঙ্কর জায়গায় এই গভীর রাতে লোকটা কী করে এল? ওর কি প্রাণের ভয় নেই?

কথাগুলো চকিতেই আমার মনে খেলে গেল।

মাত্রই কয়েকটা মুহূর্ত। তার পরে, যেন-বা আমার অস্তিত্ব টের পেয়েই মাচানের দিকে তাকাল মূর্তিটা।

ধকধক করে জ্বলছে একটা চোখ, আলো-আঁধারিতেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

হঠাৎই টের পেলাম, সেই চোখ আমারই দিকে এগিয়ে আসছে, কাছে—আরও কাছে।

ভয়ানক সেই পরিস্থিতি আমাকে অবশ করে ফেলেছিল। অমানুষিক চেষ্টায় সেই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে দ্রুত হাতে রাইফেল তুলে নিশানা ঠিক করলাম। তারপরেই কী করছি না-ভেবে ট্রিগার টানলাম···।

রাইফেলের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে জেগে উঠল রক্ত-জল-করা একটা অমানুষিক আর্তনাদ। সঙ্গে-সঙ্গে রাইফেলটাও আমার অবশ হাত থেকে নীচে পড়ে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে এলে টের পেলাম, মাচানে উপুড় হয়ে পড়ে আছি, সারা শরীর ঘামে জবজব করছে।

সারারাত কীভাবে কাটিয়েছি মনে নেই। ভোরের আলোই আমাকে ফের বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। রাতের সেই দুঃস্বপ্ন আর নেই। মাচান থেকে নেমে রাইফেলটা তুলে নিলাম। সেটার কোনো ক্ষতি হয়নি।

পোড়ো ভিটের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম, বিরাট একটা বাঘ সেটার সামনে মরে পড়ে আছে। বাঘটার একটা চোখ কানা।

কিন্তু কানা গুনিন? তাহলে তাকে গুলি করিনি? গতরাতের সবকিছুই তা হলে আমার কল্পনা? আসলে বাঘটাকেই দেখেছি?

আজও এর উত্তর পাইনি। কানা গুনিনের কথাও আর শোনেনি কেউ।

ছবি : অনুপ রায়

নিত্যি অভাব নিত্যি জ্বালা নিত্যি অনটন
বিদ্যালয়ে পৌঁছুতে তিন মাইল হনটন ।
টিফিন টাইমে খাব কি যে ট্যাঁকতো ফাঁকা মাঠ
দুবেলাতেই শুকনো রুটি যেমনি পোড়া কাঠ ।
জনপ্রিয়র দৌলতে আজ অভাব কিছু নাই
পিতামাতা ভ্রাতা মিলে ফুর্তি করে যাই ।

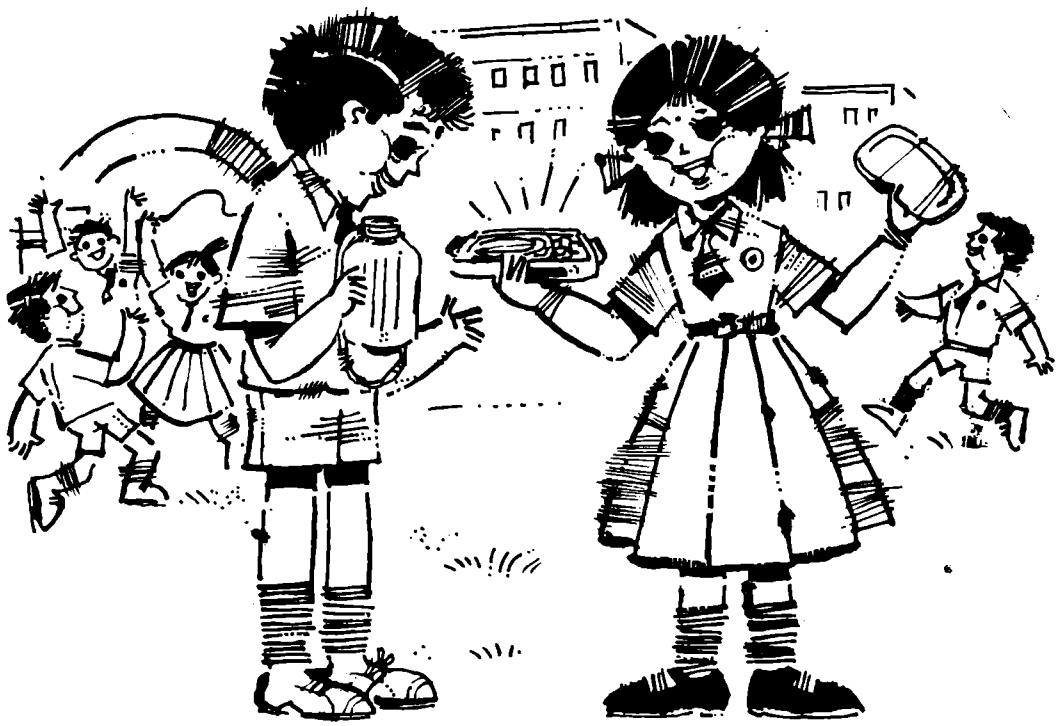

জনপ্রিয় ফাইনান্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ১৪৭ লেক টাউন, বি ব্লক, কলিকাতা-৭০০০৮৯ গ্রাম : JANAVEST
হেড অফিস : ৮/১এ, লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১
কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪ই/১০ ঝাণ্ডেওয়ালা এক্সটেনশন, নয়াদিল্লি-১১০-০৫৫
দক্ষিণাঞ্চলীয় কার্যালয় : রাহেজা কমপ্লেস, ৮৩৪ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-৬০০০০২
পশ্চিমাঞ্চলীয় কার্যালয় : ১এ, থার্ড ফ্লোর, ফাইন মেনশন, ২০৩ ডাক্তার দাদাভাই নওরোজী রোড, ফোর্ট, বম্বে-৪০০০০ ।

আমরা সংগৃহীত অর্থ সরকার বা সরকারী সংস্থায় বিনিয়োগ করে থাকি

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস বা সাব ব্রাঞ্চ অফিস আছে ।

সহজে ইংরেজি

এবার দূরে যাওয়া

হায়দরাবাদের অতিথিরা ফিরে গেছেন। যাবার আগে বারবার বলে গেছেন, সবাই যেন এবার তাঁদের দেশে বেড়াতে যান। বেড়াতে যেতে আর কার না ভাল লাগে।

Both Mr and Mrs Mahidhara were very pressing in their invitation. And they seemed such pleasant, friendly peopie that it was hard not to accept their invitation. How could anybody say 'no' to such people?

Naturally, Daddy said they'd be very glad to come when they had an opportunity.

The Mahidharas weren't satisfied with a vague promise.

"How about this Christmas?" Mr Mahidhara asked. "It's very pleasant down there in winter."

Both chambal and Chameli pricked up their ears to hear what Daddy had to say to this proposal.

"Well," he said, "I don't know. It's a long journey and it will require some planning."

Mrs. Mahidhara said, "Start planning now so that you can come at Christmas."

তারপর থেকে হায়দরাবাদ যাওয়া নিয়ে প্রায়ই কথা হচ্ছে।

Mummy said, "It's not such a long way to Hyderabad.I do suppose we could think of going. There are very fast trains these days."

Daddy said, "I know there are. And a long journey is itself a treat for children."

Chambal had got hold of a time-table.

"Look, Daddy," he suddenly cried, "I've a better idea. We could stop over at Waltair for a day or two."

Daddy said, "Yes, that might be a good plan. We can break our journey at Waltair."

Mummy liked the idea, too.

"I've never been to Waltair," she said. "I should love to go there. But where could we stay at Waltair?"

Daddy said, "There are good hotels. We could send a telegram to one, and book rooms in advance."

Chameli was listening to all this and was growing more and more excited.

"This could be the best holiday of my life," she was saying to herself.

এবারে এই শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করো :

COULD

১) এর একরকম ব্যবহার নীচের শব্দটির অতীতকালের রূপ হিসাবে

CAN

How could anybody say 'no' to such people?

২) কিন্তু বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কথা বলতেও শব্দটির ব্যবহার করা হয়। তাতে কী বোঝায় ? কোনো কিছু হলেও হতে পারে, কিছু করলে করা যেতে পারে, এই ধরনের ভাব এতে প্রকাশ পায়।

We could think of going.

We could stop over at Waltair.

Where could we stay at Waltair?

We could send a telegram.

This could be the best holiday of my life.

প্রসাদ

জেনে নাও

ফুলের রঙ কালো হয় না কেন

কত রঙের ফুলকেই তো আমরা ফুটতে দেখি—হলদে রাধাচূড়া, লাল জবা, সাদা বেল, বেগুনি অপরাজিতা, কিন্তু কোনো ফুলকেই একেবারে কালো রঙের হতে দেখি না কেন ?

ফুলের পাপড়ির কোষ আছে। এই কোষের ভেতরে একরকম তরল পদার্থ থাকে তাকে বলে কোষ-রস। আমাদের বর্ণালিতে সাতটা রঙ (VIBGYOR)। কোষ-রস বর্ণালির কোনো একটা রঙকে শুষে নেয়। সে যে রঙটাকে শোষণ করে ফুলে সেই রঙেরই আমরা বাহার দেখি।

কিন্তু কোষ-রস এক-এক ফুলের বেলায় এক-একটা রঙকে শুষে নেয় কেন ?

যে কোষ-রস ফুলের রঙের কারণ তা হয় অম্লযুক্ত হবে, না হলে ক্ষারযুক্ত। অম্ল আর ক্ষারের অনুপাত সব সময়ে সমান নয়। এই অনুপাত এক-এক কোষ-রসে এক-একরকম। সেই জন্যে বরাবর একটা বিশেষ রঙ-কে না টেনে অনুপাত অনুযায়ী সে বর্ণালির কোনো একটা রঙকে টেনে নেয়। আর যে রঙটাকে সে টানে সেটাই হল ফুলের রঙ।

ভৌত বিজ্ঞানের একটা নিয়ম আছে। বর্ণালির সব কটা রঙ-ই যদি কোষ-রসের একসঙ্গে শুষে নেবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ফুলের পাপড়ি কালো দেখাত। কিন্তু কোষ-রস একসঙ্গে একটার বেশি বর্ণালির রঙ শুষে নিতে পারে না।

কিন্তু স্থলপদ্ম সকাল-বিকেল রঙ বদলায় কেন ? তার কারণ সূর্যের উত্তাপে কোষ-রসে অম্ল ক্ষারের ভারসাম্য বদলে যায়। তাই ফুলের রঙ বদলায়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

টিনটিন

কী কাণ্ড বলো তো! হাত দেখালেও কেউ গাড়ি থামায় না! দেশটা একেবারে বর্বর হয়েগেল!
ওই আসছে!
জন্তু! স্বৈরাচারী! মুনাফাখোর! ভ্যাগাবণ্ড!
আইন থাকা উচিত, যাতে এরা থামতে বাধ্য হয়!
আর-একটা গাড়ি!
এটাও থামবে না!
থেমেছে!
ক্রি-ই-ই-ই-চ
আছে, এখনও কিছু ভদ্রলোক আছে!
টিনটিন! দাঁড়াও! থামো!
?
লুকোও!
এসো, শুয়ে পড়ো!
এখানে শোব কেন?
ঝপাস
ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন?
সিট্রোয়েন-গাড়িটা চিনতে পারলে না? গুলি চালাবে!
ধুর! সেটায় ছিল অন্য দেশের নাম্বার-প্লেট!
ঠিক জানো?
নিশ্চয়! শিগগির এসো! গাড়িটা চলে না যায়!

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

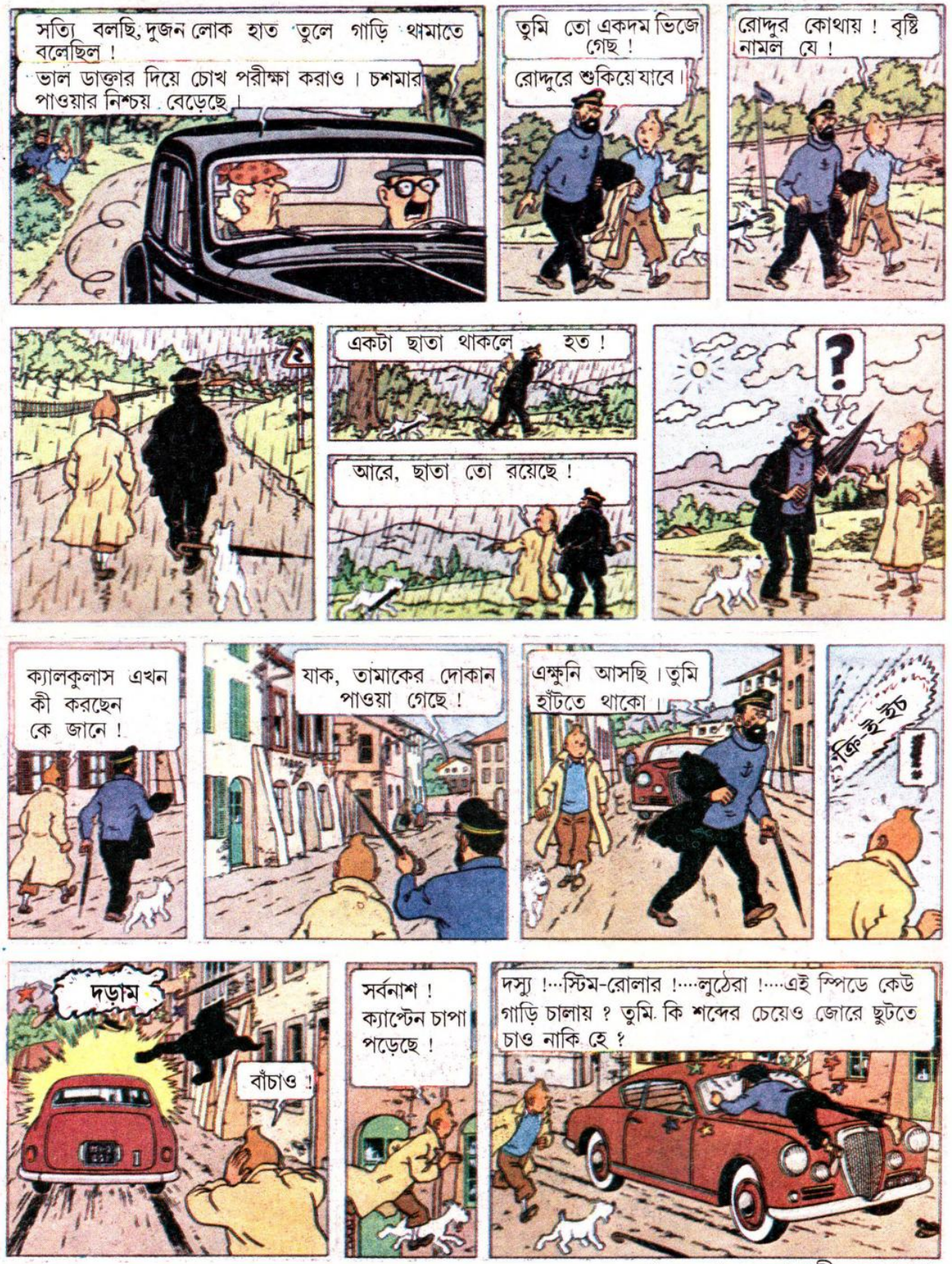

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
আজ দুই চিরশত্রু মেলবরো ও মেলচেস্টার রোভার্সের খেলা। মেলবরোর কোচ জ্যাকসন বলেছে, রোভার্সকে হারাবেই। রোভার্স মাঠে নেমেছে...
রোভার্সকে আমরা হারাবই!
জ্যাকসনের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দাওনি কেন?
ঘাবড়ে গিয়েছিলে বুঝি?
মেলবরো মাঠে নামল...
জ্যাকসনের জুড়ি নেই!
শাবাশ জ্যাকসন!
আজ আমরা জিতবই!
হেকলাভিক হারিয়েছে! আমরাও হারাব!
তিন গোলে!
হেকলাভিক! হেকলাভিক!
কী বলছে শুনেছ?
কান দিও না!
হেকলাভিকের কাছে পরাজয়ের জ্বালা জেরি হলওয়ে আজও ভোলেনি!
জেরি নার্ভাস হয়ে না-পড়ে!
চেপে ধরো!
জেরি আটকাতে পারল না!
যাঃ!
লেসি তোকে কাটাল!
হেকলাভিক!
কিন্তু সামলে নিল জেরি...
লম্বা করে থ্রো দাও!
যাক, এবারে আটকেছে!

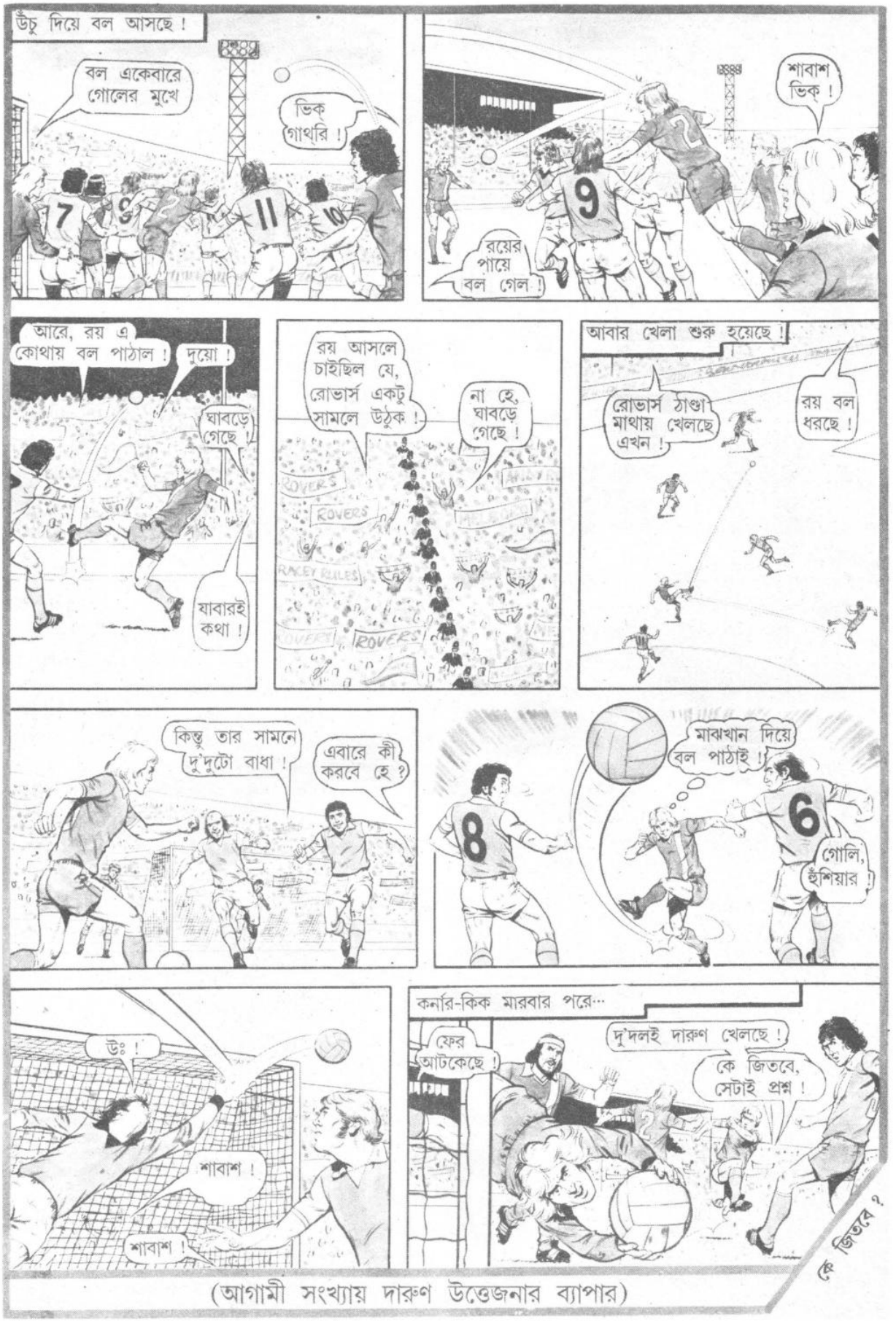

(আগামী সংখ্যায় দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার)

নিকোলাও মানুচির গল্প

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

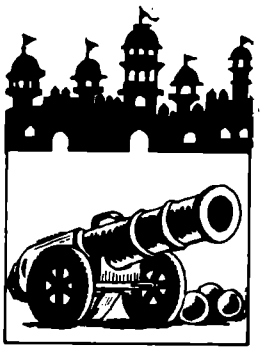

১৬৫৩ সাল, নভেম্বর মাস। ইটালির ভেনিস বন্দরে একটি ছোট জাহাজ অপেক্ষা করছিল। এক-মাস্তুলের জাহাজ, বড় সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হয়নি। এই জাহাজে সেদিন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছদ্মনামে দূরদেশে পালাবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর নাম লর্ড বেলমণ্ট। ইংল্যাণ্ডে তখন বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। অলিভার ক্রমওয়েল দেশের শাসক। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁদের বিপদ হতে পারে এই মনে করে লর্ড বেলমণ্ট ভারতবর্ষের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। জাহাজ ছাড়বার একদিন পরে শোরগোল শোনা গেল। চোদ্দ বছরের একটি ছেলে জাহাজ ছাড়বার আগের দিন এসে লুকিয়ে ছিল। পরের দিন খিদের কষ্ট সইতে না পেরে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে ধরা দিয়েছে। ছেলেটির নাম নিকোলাও মানুচি। অনেকদিন থেকে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। পৃথিবী ঘুরে দেখবে। বাবার কড়া নজর ছিল, এইবার সে বাবার চোখ এড়িয়ে জাহাজে এসে লুকিয়ে ছিল। লর্ড বেলমণ্টের একটি ছোকরা চাকরের দরকার ছিল, যে তার কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখবে, দেখাশোনা করবে। মানুচিকে তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। মানুচিকে তিনি কাজে বহাল করলেন।

জাহাজের প্রথম গন্তব্য স্মার্না। স্মার্না তুরস্ক দেশের একটি বন্দর। সাতদিন স্মার্নায় থাকবার পরে জাহাজ আবার চলতে লাগল। এ সব জাহাজ জোরে যেতে পারে না। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা পারস্য দেশের সিরাজ শহর হয়ে বন্দর আব্বাসে পৌঁছলেন। খোলা সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য বড় জাহাজ দরকার। মানুচি ও তার প্রভু 'সি হর্স' জাহাজে জায়গা পেয়ে ১৬৫৬ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরে এসে পৌঁছলেন।

সুরাট সমুদ্রতীরে নয়। মাইল দশেক ভেতরে একটি নদীর ওপরে। সেখান থেকে হাঁটাপথে বুরহানপুর, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর হয়ে শেষে আগ্রা। মোগল সম্রাট কিন্তু তখন দিল্লিতে ছিলেন। মথুরা হয়ে দিল্লি যাবার পথ, কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই মানুচির মনিব হঠাৎ মারা গেলেন। মানুচি একা দিল্লি এসে পৌঁছলেন। তখন সম্রাট শাজাহানের বয়স হয়েছে। তাঁর চার ছেলেদের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হবে বোঝা যাচ্ছিল। মানুচি শাজাহানের বড় ছেলে দারার সৈন্যদলে গোলন্দাজের পদ পেলেন। সে সময় ইউরোপ থেকে কোনো বিদেশী এলে দুটি চাকরি সব সময় পাওয়া যেত। হয় সৈন্যদলের চাকরি, নয় ডাক্তারের কাজ। তাঁরা এইসব বিদ্যা সত্যি জানেন কি না কেউ জিজ্ঞাসা করত না। মানুচিরও সেইজন্য কাজ পেতে অসুবিধা হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল।

আগ্রার কাছে সমুগড়ের যুদ্ধে দারার বড় রকমের হার হল। যুদ্ধের পরে মানুচি সমুগড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে আবার তিনি সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। এবার আওরঙ্গজেবের দলে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলেও তিনি বেশিদিন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবকে তাঁর পছন্দ হত না। তাঁর সৈন্যদল ছেড়ে দিয়ে মানুচি পুবদিকে পালিয়ে গেলেন। পাটনা পৌঁছে নৌকো করে রাজমহল এসেছিলেন। সেখান থেকে পূর্ববঙ্গে ঢাকা। আবার সুন্দরবনে ঘুরে হুগলি, হুগলি থেকে কাশিমবাজার, সেখান থেকে সবশেষে আগ্রা। সেনাদলে নাম লেখাবার ইচ্ছা ছিল না। আগ্রায় এসে তিনি ডাক্তার হয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন। অন্য বিদ্যার মতো ডাক্তারি-বিদ্যা শিখতেও সময় লাগে। কোথা থেকে মানুচি ডাক্তারি শিখেছিলেন জানি না। ডাক্তারিতে তাঁর কিছু পসারও হয়েছিল। সাহেব-ডাক্তারদের চাহিদা ছিল। বাত কিংবা রক্তচাপের রোগীদের চিকিৎসাই ছিল শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বের করে দেওয়া। এই কাজ ইউরোপীয়রা ভাল করতেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি ডাক্তারও রইলেন না। অম্বরের রাজা জয়সিংহের ছেলে কিরাতসিংহ তাঁকে আবার গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি করে নিয়ে এলেন। মাইনে ঠিক হল দিনে দশ টাকা। তখনকার দিনের হিসাবে বেশ ভাল।

রাজপুত সৈন্যদের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতবর্ষে এলেন। তখন ১৬৬৪ সালের মাঝামাঝি। তখন বিদেশীরা অনেক সময় ভারতীয়দের মতো পোশাক পরতেন, মানুচিও তাই। তিনি দাড়ি কামিয়ে ফেলে রাজপুতদের মতো গোঁফ রাখতেন। রাজপুতরা কানে গয়না পরতেন, তিনি পরতেন না। আচকান পরতেন, তার বোতাম আটকাতেন মুসলমানদের মতো করে। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত, "মানুচি, তুমি হিন্দু না মুসলমান ?"

মানুচি বলতেন, "আমি কিছুই নই, আমি খ্রিস্টান।"

তারা বলত, "সে তো আমরা জানি, কিন্তু তুমি বলো—তুমি হিন্দু-খ্রিস্টান, না মুসলমান-খ্রিস্টান।"

মানুচি খুব রেগে গিয়ে বলতেন, "এদেশের লোক খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে এত কম জানে যে, সে আর বলবার নয়।" সুবিধা পেলে খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। দক্ষিণ ভারতে তখন শিবাজির আধিপত্য। মানুচি একবার শিবাজিকে দেখেছিলেন। সৈন্যদলে আর থাকতে ভাল লাগছিল না তাঁর। মানুচি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বোম্বাইয়ের কাছে বেসিনে চলে এলেন। এটা পর্তুগিজদের এলাকা। কিছুদিন পরে মানুচি আবার বেসিন ছেড়ে লাহোরে ডাক্তার হয়ে বসলেন। ছ-সাত বছর ডাক্তারি করলেন। কিন্তু মানুচির টাকা-পয়সার একটু টানাটানি হয়েছিল। ব্যবসায় টাকা খাটাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার ফল ভাল হয়নি। তিনি আবার দিল্লি ফিরে গিয়ে ডাক্তারি আরম্ভ করলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহ আলমের বেগমের

কানের চিকিৎসা করে তাঁর নাম হয়েছিল। মানুচি বলেছেন যে, তাঁর এত নাম-ডাক আর পসার হয়েছিল যে, দিল্লির ডাক্তাররা তাঁকে দেখতে পারত না। একদিন তিনি রোগী দেখছিলেন, ঘরে রোগীদের ভিড় হয়েছে। এমন সময় কয়েকজন গুণ্ডার মতো লোক এসে গোলমাল করতে আরম্ভ করল, যাতে রোগীরা ভয় পেয়ে অন্য কোথাও চলে যায়।

মানুচি বুঝতে পারলেন যে, এ-সব সাজানো ব্যাপার। অন্য ডাক্তাররা গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করছে। তিনি তাঁর লোকদের বললেন, "ধরো ওদের।"

সবাই পালিয়ে গেল তাড়া খেয়ে, কিন্তু একজনকে ধরা গেল। তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। মানুচি তাকে বললেন, "তোমার ব্যবহারে বোঝাই যাচ্ছে যে, অনেক বদ রক্ত ঢুকেছে, তা বের করে না দিলে নয়।" এই বলে তার শরীর থেকে অনেকটা রক্ত বার করে নিলেন। লোকটি খুব চেঁচাতে লাগল। তারপর বলল, এর শোধ নেবে সে। মানুচি বললেন, "আগে তো বাঁচো, বদ রক্ত বের করে দিই।" এই বলে তার শরীর থেকে অনেক রক্ত মিছিমিছি বার করে নিলেন। তারপর লোকটিকে বললেন, "ভাগ্যিস আজ এসেছিলে, খুব বেঁচে গেলে।"

অত রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিল বলে লোকটি বোধহয় একটু দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় সে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে গেল। বলল, তাঁর জন্যই তার প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

মানুচিকে বোধহয় আর কখনও এরকম বিপদে পড়তে হয়নি। শাজাহানকে যখন তাজমহলে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখনকার ব্যাপার নিয়ে মানুচি একটি গল্প লিখে শুনিয়েছেন।

শাজাহানের মৃতদেহ তাজমহলে নিয়ে আসা হল। সঙ্গে শাজাহানের প্রিয় হাতি ছিল। হাতিটি বাইরে বাঁধা, কিন্তু লক্ষ করছিল কী একটা শোরগোল হচ্ছে, কেন সে বুঝতে পারছে না। এমন সময় মাহুত কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওরে তোর আজ দুর্দিন। সম্রাট আর নেই। কে তোর পিঠে চড়বে, তুই তো আর এরকম প্রভু পাবি না?"

হাতি সব কথা বুঝতে পারল। সে শুঁড় দিয়ে ধুলো এনে নিজের দেহে ছড়িয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। তারপর হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। ঘটনাটি বোধহয় সত্যি। মানুচি এরকম অনেক গল্প লিখে গিয়েছেন। দু-চারটি গল্প পরে শোনানো যাবে।

শেষ বয়সে মানুচি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ছ-সাত বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

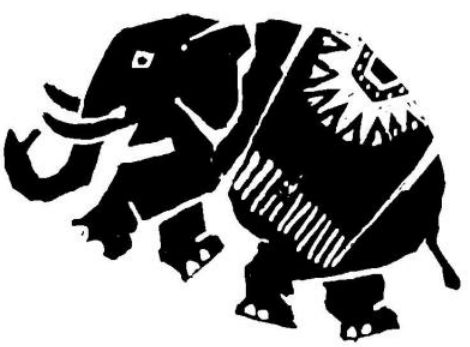

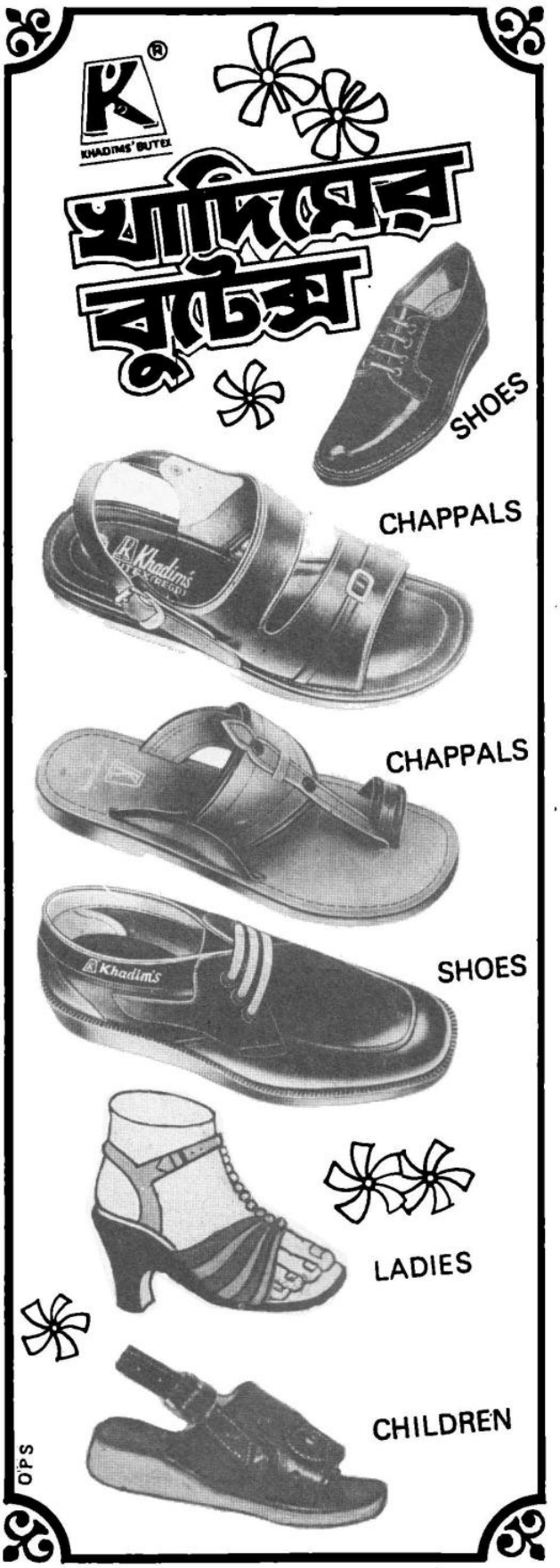

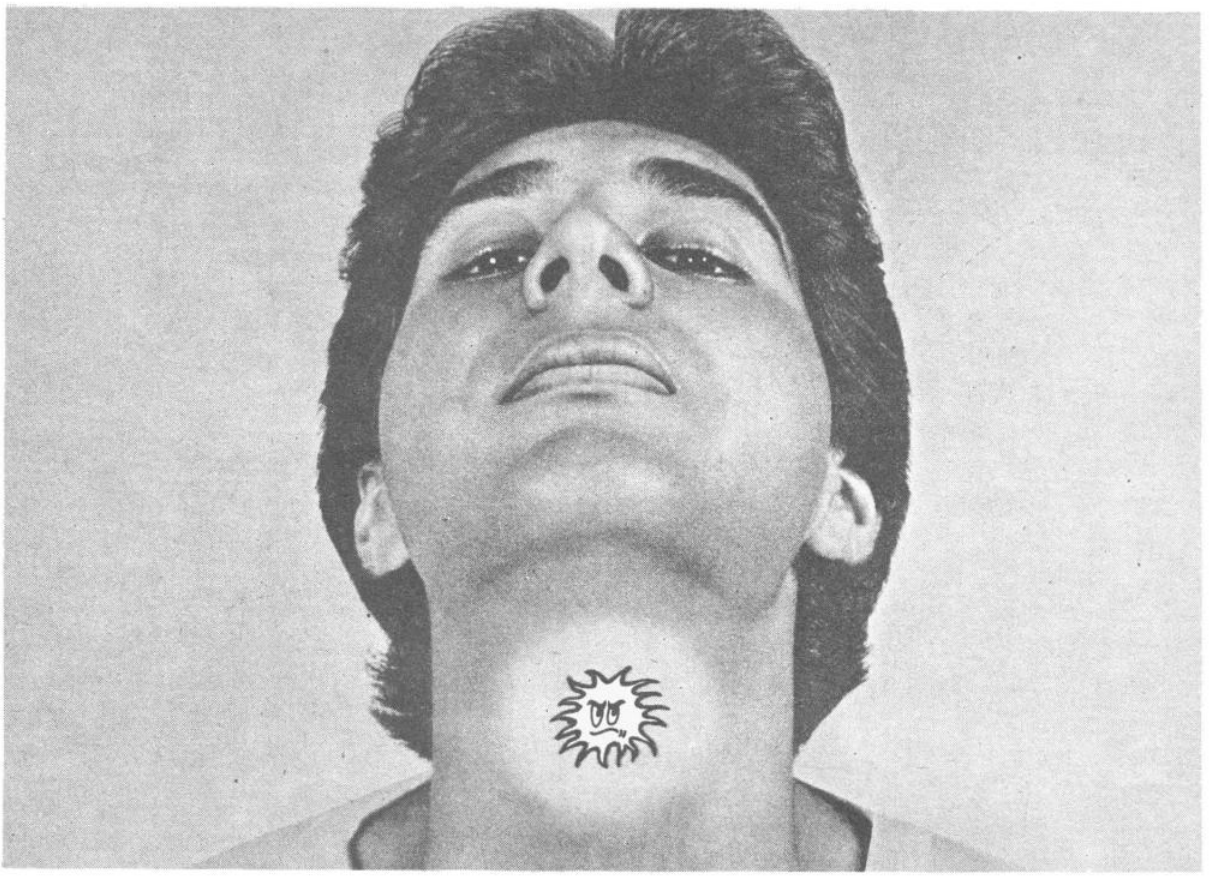

গলার 'খিচখিচ' দূর করুন...

'খিচখিচ' কি ?

যখনই আপনার গলা খুশখুশ করবে, অথবা গলা শুকিয়ে যাবে —তখনই বুঝবেন যে আপনার গলায় 'খিচখিচ' এসেছে।

ভিক্স নিয়ে নিন
'খিচখিচ' দূর করুন

ভিক্স নিয়ে নিন
ভিক্স কাশির বড়িতে গলায় আরামদায়ক ৬ টি ভিক্সের ঔষধি আছে, যা 'খিচখিচ' দূর করে।

তার জন্য যখনই
গলায় খিচখিচ' আসবে,
ভিক্স নিয়ে নিন।

ভিক্স নিয়ে নিন!

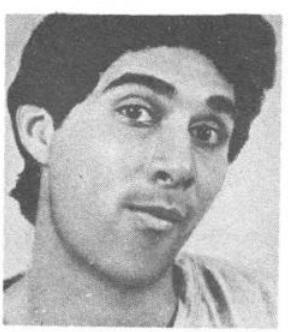

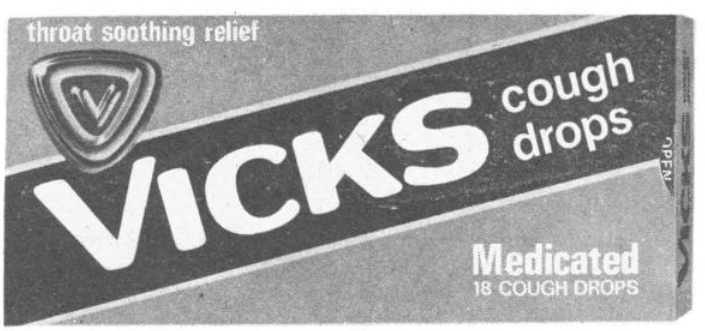

OBM/1829 BEN

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। এখানে এককড়ি নামে একজন লোক রান্নার কাজ করে। সে বেশ পাগলাটে ধরনের। জ্যাঠামশাই কোথায় গেছেন তা সে জানে মনে হয়। কিন্তু তার উল্টোপাল্টা কথা শুনে কিছুই বোঝা যায় না। রাত্তিরবেলা দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি বাইরে এল, পুকুরঘাটের কাছে সে দেখতে পেল একজন রহস্যময় অচেনা মানুষকে। সকালে ইরানি ঘুম থেকে উঠে আর দিপুকে খুঁজে পেল না। এককড়িকে নিয়ে সে গেল থানায়। মাঝপথে এককড়ি পালিয়ে গেল। তারপর···

অমিত পরীক্ষা দিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই জিজ্ঞেস করল, "ছোটমা, দিপুরা ফেরেনি ?"

মা দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া। অমিতকে দেখে সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করে বললেন, "না রে, এখনো তো এল না! বর্ধমানের ট্রেন ক'টায় আসে ?"

অমিত জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "সারাদিন অনেক ট্রেন আসে। ওদের তো দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল !"

মা চুপ করে রইলেন।

অমিত আবার জিজ্ঞেস করল, "কাকামণি কেমন আছেন ?"

"আজ অনেকটা ভাল। দুপুরে নিজেই হেঁটে হেঁটে বাথরুমে গেলেন। হ্যাঁ রে অমিত, আজ ট্রেনের কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো ? প্রায়ই তো কী সব গোলমালে ট্রেন আটকে যায় !"

"সে রকম কিছু শুনিনি তো কাকিমা ! আমাদের কলেজের অনেক ছেলেই তো ট্রেনে আসে। সবাই আজ এসেছে। দীপ্তেন্দু আসে শক্তিগড় থেকে, তার সঙ্গেও দেখা হল। ট্রেনের কিছু গোলমাল হলে নিশ্চয়ই সে বলত !"

"তোর কাকা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ! জানিসই তো, দিপুটা একটু পাগলাটে স্বভাবের। কোথায় না কোথায় চলে যায় !"

"ইরানি তো সঙ্গে আছে। ও ঠিক বকে বকে দিপুকে সামলে রাখতে পারবে। রঘু কী বলেছে, ওরা আজ সকালেই ফিরবে বলেছিল তো ?"

"তাই তো বলেছিল !"

"রঘু, রঘু ! শোন্ তো এদিকে।"

অমিতের ডাক শুনে রঘু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদের কথাবার্তা সে শুনেছিল। অমিত কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, "আমি তো আসতে চাইনি ! দিদিমণি আমাকে ধমকে পাঠিয়ে দিলেন ! আমি থাকলে বড়বাবুকে ঠিক খুঁজে বার করতুম।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই যখন চলে এলি, তখন তোকে ওরা কী বলে দিয়েছিল ? আজ ফেরার কথা বলেনি ?"

"ইরানি দিদিমণি বলেছিল, কিন্তু দিপুদা কিছু বলেনি !"

"ইরানি তো বলেছিল ঠিক আজ ফিরবে, তা হলে এল না কেন ?"

"রাত্তিরে কী হয়েছে কে জানে ! ও জায়গাটায় ভূত আছে !"

অমিত বলল, "চাপ্, বাজে কথা বলিস না !"

রঘু চোখ কুঁচকে, মাথা নেড়ে বলল, "আমায় বকো আর যাই করো আমি তবু বলব, ও জায়গাটায় ভূত আছে !"

মা বললেন, "তুই দিনের বেলায় গেলি, দিনের বেলাতেই ফিরে এলি, তার মধ্যে কি তুই ওখানে ভূত দেখে ফেললি ?"

রঘু বলল, "দেখতে হবে কেন ! জায়গাটাতেই ভূত-ভূত গন্ধ ! বাজ পড়ে পুকুরের জল শুকিয়ে যায়, যখন-তখন বৃষ্টি নামে, এই যে মাত্তর এইটুকুনি জায়গা জুড়ে। এককড়ি বলে একটা লোক আছে, তাকে দেখলেই মনে হয় ভূতের মন্তর জানে !"

অমিত বলল, "এককড়ি তোকে দেখে আবার কিছু মন্তর-টন্তর পড়েনি তো ?"

রঘু বলল, "আমায় কেউ কিছু করতে পারবে না। এই দেখছ না, আমার গলায় এই মাদুলি রয়েছে ! আমাদের গেরামের মা-কালীর মন্দিরের মাদুলি। আমাদের মা-কালী খুব জাগ্‌গ্রোত্ !"

অমিত বলল, "আমি তো তোর গা থেকেই ভূতের গন্ধ পাচ্ছি। ক'দিন চান করিসনি ?"

মা বললেন, "হ্যাঁ রে রঘু, ওরা এল না কেন ? সকালবেলায় বেরুলে তো এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা।"

রঘু বলল, "একটা কথা বলেন তো মা, দিদিমণিদের ঐ ভুতুড়ে জায়গায় রাত্তিরবেলা থেকে যাবার দরকারটাই বা কী ছিল ? রাত্তিরে কি ওনারা বনে-জঙ্গলে জ্যাঠাবাবুকে ঢুঁড়তে যাবেন ? ঐ এককড়ি যা একখানা কথা বলেছিল না, তা তো আপনাদের বলিইনি !"

"কী বলিসনি ? কী বলেছিল এককড়ি ?"

"সে শুনলে আপনারা আরও ভয় পেয়ে যাবেন !"

"আচ্ছা পাজি ছেলে তো ! কী বলেছিল বল্ ?"

"ঐ এককড়ি বলেছিল, ওখানকার গাছগুলো নাকি কথা বলে !"

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না ! মিথ্যে কথার ডিপো একটা !"

রঘু বলল, "আমি মিথ্যে কথা বলি ? মোটেই না ! মা-কালীর দিব্যি বলছি !"

মা ধমক দিয়ে বললেন, "অ্যাই, তোকে বলেছি না যখন-তখন ঠাকুর-দেবতার নামে দিব্যি কাটবি না !"

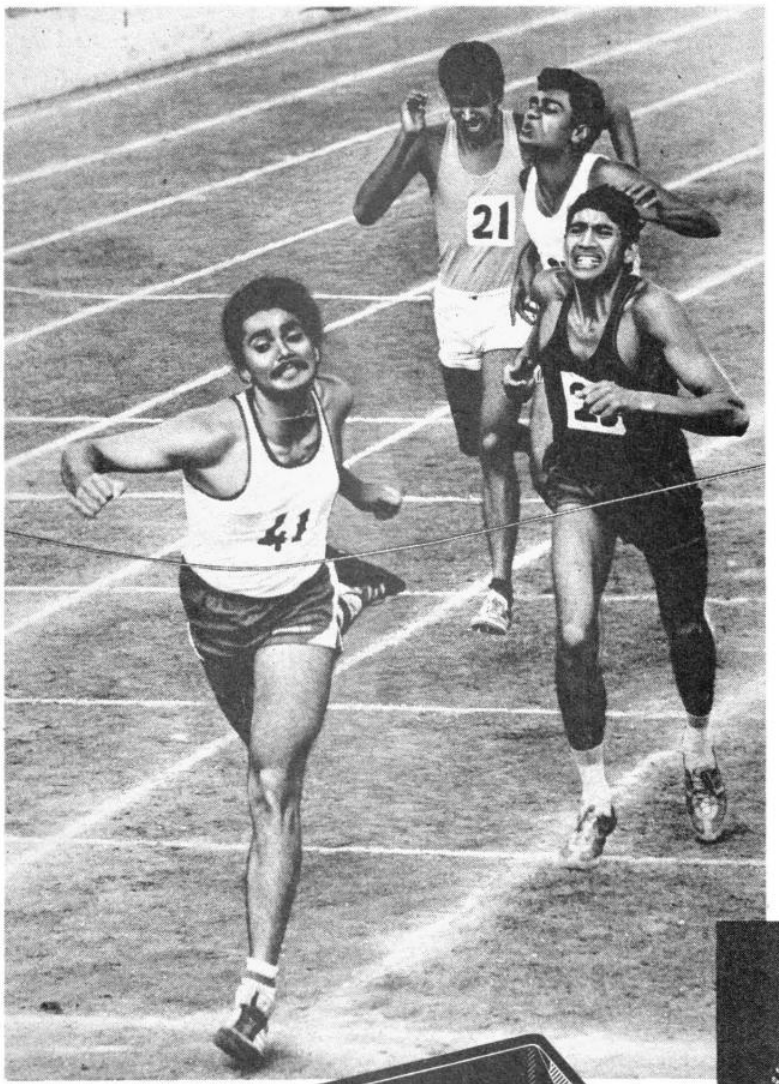

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও
সেখানে

লাইফবয়—স্বাস্থ্যেরই নাম। সারাদিন ধরে খাটুনীর পরে ... কিম্বা প্রচণ্ড হুটোপাটি করে খেলার মজার পরে, লাইফবয় দিয়ে স্নানের মজাই আলাদা! এ আবার আপনার মাঝে জাগিয়ে তোলে—এক সাফ আর সুস্থ অনুভূতি!

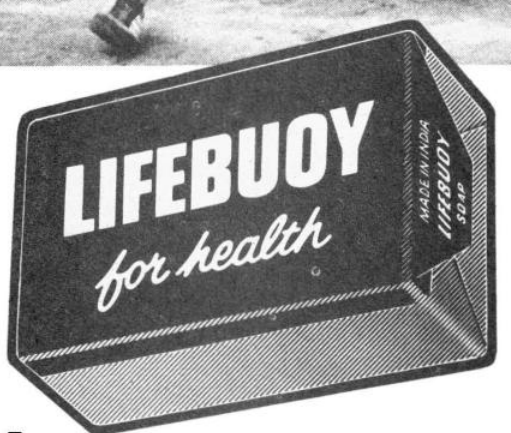

লাইফবয় ধূলোময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS L 88 2116 BG

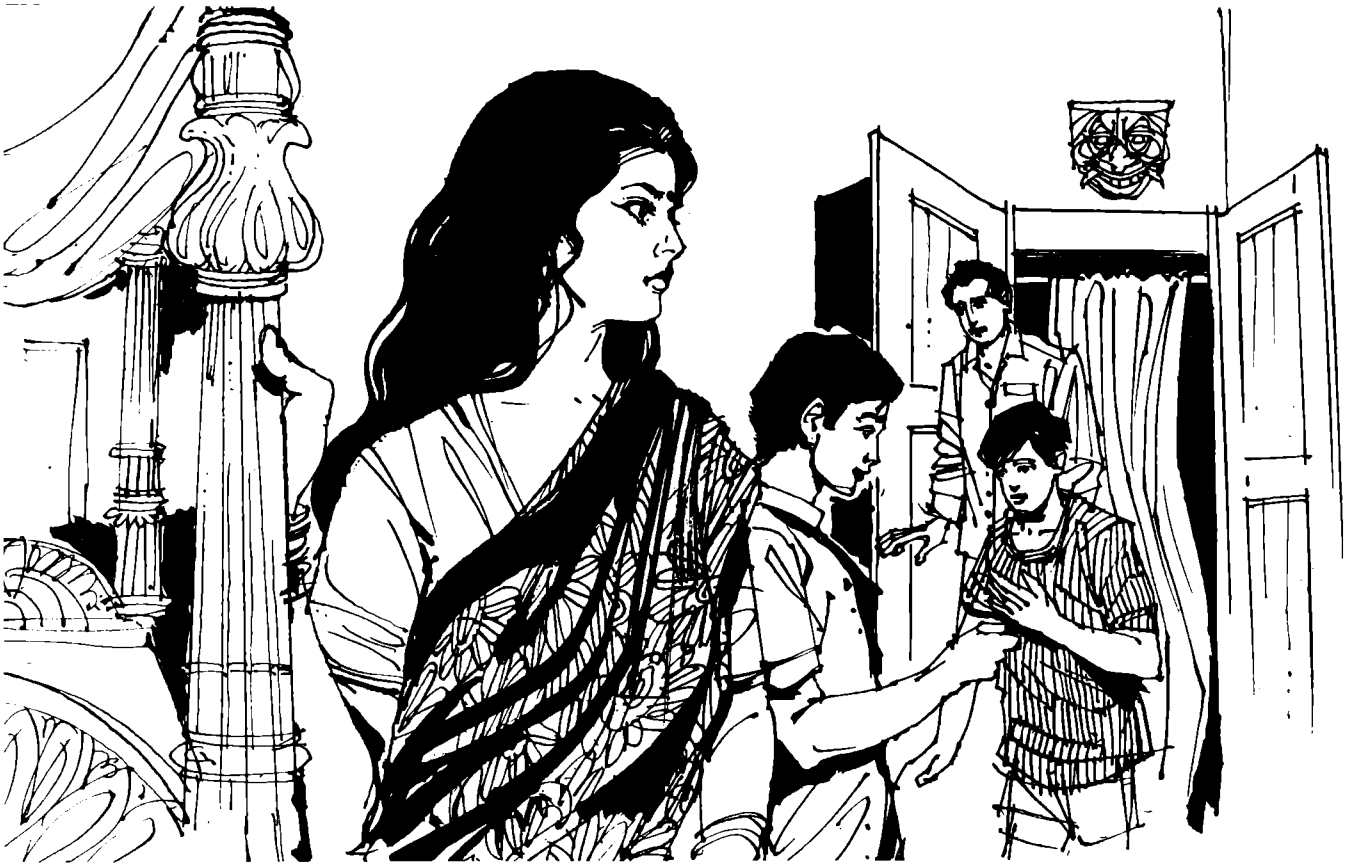

অমিত বলল, "আমি ওখানে কতদিন থেকেছি, চমৎকার জায়গা !"

রঘু তবু বলল, "ওখানকার নেবুবাগানটার মধ্যে একটা পাগলকে দেখেছিলুম। সে তো গাছপালার কথা শুনে-শুনেই পাগল হয়ে গেছে !"

অমিত বলল, "মুর্শেদ মাস্টার ! তবে তাকে আমি চিনি। সে ওইরকমই !"

দোতলার ঘর থেকে বাবা রঘুর নাম ধরে ডাকলেন। তারপর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রঘু, কার সঙ্গে কথা বলছিস ? অমিত ফিরেছে ?"

মা বললেন, "রঘু, তুই যা। বাবুকে গিয়ে বল অমিত যাচ্ছে একটু পরে !"

রঘু চলে যেতেই মা বললেন, "কী হবে এখন অমিত ? তোর কাকা যে বড্ড উতলা হয়ে পড়েছেন ?"

অমিত ভুরু দুটো কুঁচকে বলল, "এমন বিচ্ছিরি সময় আমার পরীক্ষাটা পড়ল ! বাবার কোনো খবর নেই। ইরানি আর দিপু গিয়েও ফিরল না ! কাকিমা, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে !"

মা বললেন, "দিপুটা পাগলাটে হলেও ইরানির তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। ওর তো ফিরে আসা উচিত ছিল। ওদের আবার কোনো বিপদ হয়নি তো !"

অমিত বলল, "ওখানে মধুদা আছে, কেষ্ট আছে। তারা খুব বিশ্বাসী ? তারা থাকতে ওদের কোনো বিপদ হতে পারে না। কাকিমা, আমি আজই সাড়ে-সাতটার ট্রেনে চলে যাব ?"

"পরীক্ষাটা নষ্ট করবি ? চল, তোর কাকাকে বলি, যদি আর কারুকে পাঠানো যায় !"

অমিতের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাবা খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত হেঁটে চলে এসেছেন। মা এসে বললেন, "তুমি এর মধ্যেই এত হাঁটাহাঁটি শুরু করলে কেন ? প্রিয়তোষবাবু তোমায় বিশ্রাম নিতে বলেছেন !"

বাবা বললেন, "তোমাদের কথা শুনেই তো আজ দিপু আর ইরানিকে পাঠাতে রাজি হলুম। আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। রঘুর মুখে তো শুনলে যে ওরা ওখানে গিয়ে দাদার কোনো খোঁজ পায়নি। নিজেরা সর্দারি করে থেকে গেছে। এখন কিসের থেকে কী যে হয় !"

অমিত বলল, "কাকামণি, আমিই বরং চলে যাই আজ। একটা পরীক্ষা নষ্ট হলে কী আর হবে !"

বাবা বললেন, "তুই গিয়েই বা কী করতে পারবি ? আমি না গেলে কোনো কাজ হবে না। এক কাজ কর, একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারবি ? মেমারি আর কতটাই বা দূর ! গাড়িতে করে যাব, সব খোঁজখবর নিয়ে কাল সকালের মধ্যে ফিরে আসব !"

মা বললেন, "তুমি যাবে ভাঙা পা নিয়ে ! তারপর তুমি নিজেই একটা কিছু বিপদ ঘটাবে। আমার দাদার বাড়িতে খবর পাঠাচ্ছি। ওখানে কারুকে না কারুকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই !"

এমন সময় জুতো মশমশিয়ে ওপরে উঠে এলেন পরিতোষ ডাক্তার। তাঁকে দেখে সবাই একসঙ্গে চুপ করে গে !

পরিতোষ ডাক্তার হালকা সুরে বললেন, "কী ব্যাপার ? কী গোপন কথা হচ্ছিল, আমায় দেখে থেমে গেলে ?"

মা বললেন, "দিপু আর ইরানি আজও ফেরেনি !"

পরিতোষ ডাক্তার তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন। এ-বাড়ির সবাই তাঁর আত্মীয়ের মতন। তিনি বুঝতে পারলেন ঘটনার গুরুত্ব। দিপু আর ইরানি দু'জনেই এখনও ছেলেমানুষ, তারা বর্ধমানের গ্রামে আগের দিন গিয়েও ফিরে আসেনি। বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল একদিনের মধ্যে ফিরে আসতে। ওরা তো জানে যে ঠিক সময়ে না ফিরলে বাড়ির সবাই কত

মৈনাক বন্দ্যো

আনন্দ ঘোষ হাজরা

হিমালয়ে উঠেছিল মৈনাক বন্দ্যো,
আজকে কারোরই আর নেই এতে সন্দ'।
মৈনাক পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল ঠ্যাং কি ?
কারণ শরীর তার অতিশয় ল্যাংকি !
এই নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল কাগজে ;
কেউ কেউ বলেছিল, "বন্দ্যোর মগজে
একফোঁটা ঘিলু নেই, শুধু মরে শঙ্কায়,
কী করে হঠাৎ গেল কাঞ্চনজঙ্ঘায় ?"
চোখ টিপে বলেছিল বন্দ্যোর ভাগ্নে,
"মামার যা কেরামতি তোরা তো জানিস্‌নে।
রান্নাঘরের পাশে মামিমার আদেশে
বসে বসে মাছি মারে একটুও না হেসে ;
বছরকয়েক আগে তার ছোটমাসিকে
সিমলেতে নিয়ে যেতে চলে গেল নাসিকে।
সেই মামা পারে না কি ?"—এই বলে ধাঁ করে
বরফের চাঁই কিনে পাহাড়ের আকারে
রেখে, ঠেলে তুলে দিল মামাকেই শীর্ষে,
ফোটোয় প্রমাণ হবে কী-রকম বীর সে !
সেই ফোটো শোভা পায় বৈঠকখানাতে,
পাহাড়বিজয়ী মামা সংবাদ জানাতে।

ছবি : অনুপ রায়

চিন্তা করবে। তবু যখন ফেরেনি, তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণে আটকে গেছে !

বাবা বললেন, "শোনো, পরিতোষ। এভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুশ্চিন্তা করলে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আজ তো অনেকটা ভাল আছি, হাঁটতেও পারছি। সেই জন্য আমি অমিতকে বলেছি একটা গাড়ি ভাড়া করতে। সেই গাড়ি নিয়ে আমি নিজেই যাব বর্ধমান।"

পরিতোষ ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললেন, "গাড়ি ভাড়া করতে হবে কেন ? আমার গাড়িই তো আছে। অরুণ, তুমি একাই বা যাবে কেন, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না ?"

বাবা বললেন, "তুমি যাবে ? তোমার রুগি-টুগি দেখা আছে। তুমি ব্যস্ত মানুষ।"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "মনে করো, আমার নিজের দাদা দূরে কোথাও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমার ভাইপো-ভাইঝিরা তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে ফিরছে না। তা হলেও কি আমি নিজের কাজের ব্যস্ততার কথা ভেবে সেখানে যেতুম না ?"

বাবা বললেন, "তা হলে চলো !"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "যাব, দরকার হলে নিশ্চয়ই যাব। তার আগে আর একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সেটা এইমাত্র আমার মনে পড়ল। পুলিশের একজন বড়কর্তার সঙ্গে আমার চেনা আছে। আমাকে খুব খাতির করেন। তাঁকে একবার বলে দেখি, পুলিশ-সূত্রে ওখানকার স্থানীয় থানা থেকে কোনো খবর আনানো যায় কি না !"

অমিত বলল, "তাতে তো অনেক সময় লেগে যাবে !"

ডাক্তার বললেন, "কেন সময় লাগবে ? ওখানকার লোক্যাল থানায় ফোন করলেই জানা যাবে !"

অমিত বলল, "আমাদের ওদিককার থানায় টেলিফোন নেই। ছোট থানা, জিপগাড়িও নেই !"

ডাক্তার বললেন, "এমনি সাধারণ টেলিফোন না থাকলেও রেডিও-টেলিফোন থাকবেই। তা দিয়ে কাছাকাছি বড় থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আগে একবার আমি বাঁকুড়ার এক গ্রামে একটা জরুরি খবর পাঠাবার জন্য পুলিশের কাছ থেকে এই সাহায্য পেয়েছিলুম। এক ঘণ্টার মধ্যে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। অমিত, তুমি ওখানকার থানার নামটা লিখে দাও তো আমাকে। তোমার বাবার নাম, গ্রামের নাম সব লিখে দাও।"

অমিত একটা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, "শোনো অরুণ, আমি চেম্বারে গিয়ে এক্ষুনি ফোন করছি। এর মধ্যে আমার আজকের কাজ যা আছে তাও সেরে নিচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনো খবর না আসে তা হলে আমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, তুমি মোটামুটি তৈরি হয়ে থেকো।"

পরিতোষ ডাক্তার ব্যস্তভাবে চলে যেতে যেতেও সিঁড়ির কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে মাকে বললেন, "শোনো বৌদি, তুমিও মোটামুটি তৈরি হয়ে নাও ! আমি আর অরুণ যদি তোমাকে এখানে রেখে চলে যাই, তা হলে তুমি যে সারারাত ঘুমোতে পারবে না তা জানি। সুতরাং তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। অমিতের পরীক্ষা, তাকে তো থাকতেই হবে !"

(ক্রমশ)

Amala—6 (14.11.84)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

পাহাড়ের তলায় বিশাল তোরণ। জাহাজ গিয়ে সেই তোরণে ঢুকছে।

ডোনা বলল, "এ যে রূপকথার রাজ্য!"
টারজান বললেন, "কিন্তু সেই রাজ্যের মানুষগুলি কেমন, সেটা জানা দরকার।"

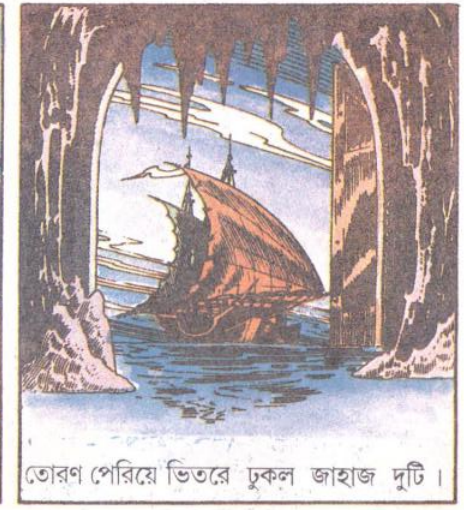

তোরণ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল জাহাজ দুটি।

সঙ্গে-সঙ্গেই টারজানের চোখে পড়ল এক আশ্চর্য দৃশ্য। ম্যাক রে বললেন, "পলিনেশিয়ানরা ছিল খুবই দক্ষ কারিগর!"

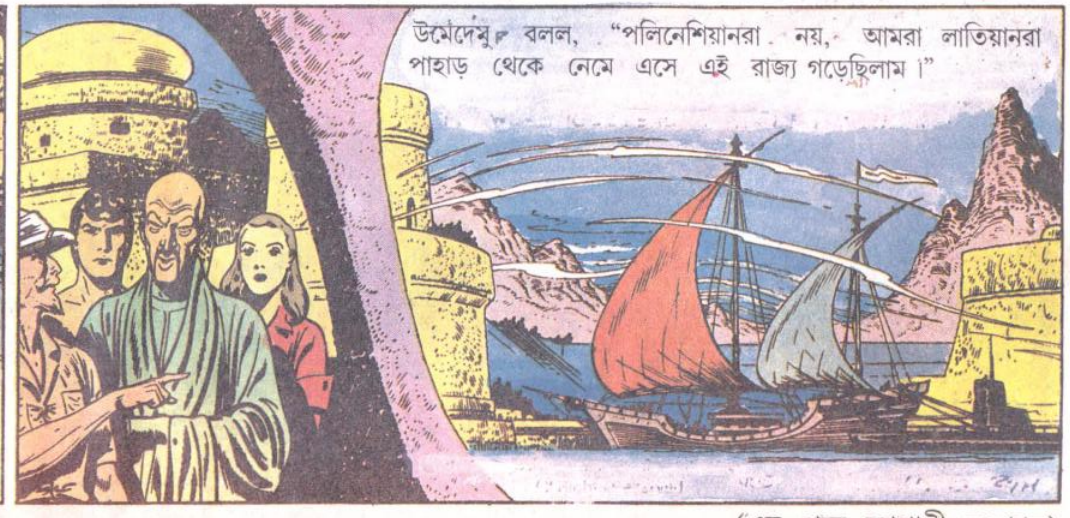

উমেদেমু বলল, "পলিনেশিয়ানরা নয়, আমরা লাতিয়ানরা পাহাড় থেকে নেমে এসে এই রাজ্য গড়েছিলাম।"

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

পি· টি· উষা। পি· টি· উষা। পি· টি· উষা। গত অলিম্পিক থেকেই সমস্ত মহলে এই একটি নাম ঘুরেফিরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়িতেও এ-জিনিস দেখেছি। সেদিন নতুন একটা খবর আনল ছোট্কা। পার্ক স্ট্রিট না কোথায় যেন বিরাট এক বিজ্ঞাপনে একটা নামী কোম্পানি খুব সূক্ষ্মভাবে পি· টি· উষার নামটা ব্যবহার করেছে। 'উষার আশ্বাস' জাতীয় হেডিং দিয়ে বিশাল দেয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপন নাকি করেছে এবার।

জানি না, ছোট্কার মনেও এমন প্রেরণা সেই বিজ্ঞাপন থেকেই এসেছিল কি না। কেননা, এবারের নতুন ধাঁধায় দেখছি ছোট্কাও উষা নামটা ব্যবহার করেছে। আর ধাঁধাটাও মুখ্যত দৌড়নো নিয়ে। সেই ধাঁধাটাই দিচ্ছি এবার।

প্রথম ধাঁধা ॥ দুই মেয়ে দৌড়বীর। একজনের নাম উষা, অন্যজনের নাম সন্ধ্যা।

উষা ও সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে ২০ কিলোমিটার দূরত্বে। একজন ট্র্যাকের এ-প্রান্তে, অন্যজন ও-প্রান্তে। দুজনে একসঙ্গে দু-প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসবে। যেখানে মুখোমুখি

হবে, সেখানেই দৌড় শেষ। উষার দৌড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪ কি· মি·। সন্ধ্যার—ঘণ্টায় ১৬ কি· মি·।

দৌড় শুরু করল দু'জনে। দু-প্রান্ত থেকে। ঠিক একই সঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা পাখিও উড়তে শুরু করল। উষার দিক থেকে উড়ে সে একবার সন্ধ্যার দিকে যাচ্ছে, আবার সন্ধ্যাকে ছুঁয়ে সে ফিরে আসছে উষার দিকে। এইভাবে চলল পাখিটারও ওড়াউড়ি, যতক্ষণ-না দুজন প্রতিযোগী মুখোমুখি হয়। শুধু যাওয়া আর আসা।

পাখিটার ওড়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৪ কি· মি·। এবার বলো, সন্ধ্যা ও উষার মুখোমুখি হওয়া পর্যন্ত মোট কত কিলোমিটার উড়বে পাখিটা ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এই তিনটি নামের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। কোথায় মিল ?

(ক) রমাকান্ত কামার (খ) হারান রাহা (গ) সুবললাল বসু

তৃতীয় ধাঁধা ॥ ১০০কে $^{১}/_{২}$ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় ? খুব চটপট বলো।

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১২ দিন। (২) মঙ্গলবার। (৩) কোনোটাই ঠিক নয়। আটে-আটে কিংবা আটের সঙ্গে আট যোগ করলে দু-ক্ষেত্রেই ষোল হয়।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১			২	■	৩	৪
	■	■		■	৫	
	■	৬		৭	■	■
৮			■	৯		১০
■	■	১১	১২		■	
১৩	১৪	■		■	■	
১৫		■	১৬			

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যাদের কোনো নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই। (৩) পথ বা উপায়। (৫) ফুলবিশেষ। (৬) কোন্ পতঙ্গের নামে একটি যোগাসন আছে ? (৮) সমুদ্র। (৯) ফুলবিশেষ। (১১) দাঁতাল যন্ত্র। (১৩) হরিণ। (১৫) কর্ণাভরণ। (১৬) গণেশ।

উপর-নীচ : (১) মহাভারতের প্রধান নারী-চরিত্র। (২) পয়গম্বর। (৩) রামমোহন যা ছিলেন। (৪) দেবতার বাহন এক জন্তু। (৬) ধীরগতির জন্য বিখ্যাত। (৭) একই নামে পাখি আর পৌরাণিক বহু চরিত্র। (১০) মহাকাশচারী। (১২) রাঙা। (১৩) কোমল। (১৪) গলা।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

শৃ	ঙ্খ	ল	■	ক	দ	ম
ঙ্গা	■	শ	ক	ট	■	খ
ট	ন	ক	■	ম	হি	ম
ক	■	র	কে	ট	■	ল
■	কৃ	■	রা	■	ল	■
বৃ	ত্তি	■	ম	■	ঘু	ঘু
ক	■	প্লা	তি	নি	■	ণ

মজার খেলা

তেরোটা দেশলাই কাঠি কিংবা টুথপিক যোগাড় করো। তাহলেই তুমি খেলার জন্য তৈরি। নীচের ছবির মতো করে কাঠিগুলোকে টেবিলের ওপর সাজাও—

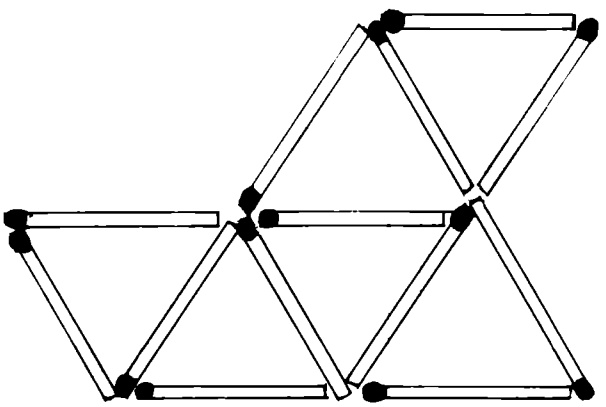

সাজিয়েছ ?

বেশ। এবার কোনো বন্ধুকে বুঝিয়ে বলো, কী করতে হবে।

সে করবে কী, এর থেকে তিনটে কাঠি এমনভাবে তুলে নেবে যাতে কিনা টেবিলে পড়ে থাকে তিনটে মাত্র ত্রিভুজ। সমান মাপের ত্রিভুজ বোলো না আবার। আর এটাও মনে রেখো যে, কাঠি তিনটে শুধু সরাতেই হবে ; নতুন করে বসাতে হবে না।

বেশ বুদ্ধির খেলা এটা। সুতরাং, নিজেই আগে চেষ্টা করো।

বন্ধু যদি না পারে, তখন তাকে সমাধানটা দেখিয়ে দাও। আর সেই সমাধানটা হবে এইরকম—

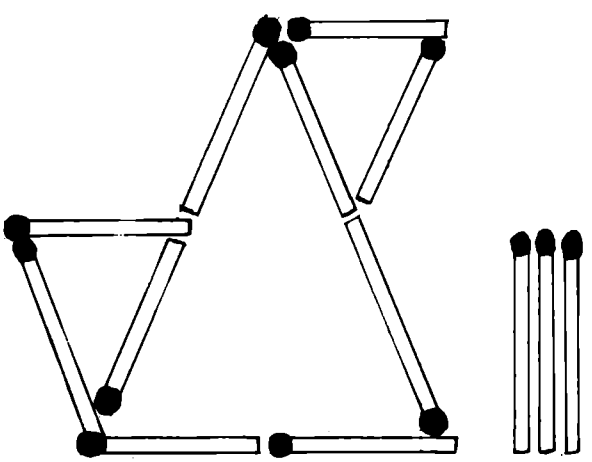

কী, তোমার সমাধানের সঙ্গে মিলেছে তো ?

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ ক্যাপ্টেন, আপনি বলছেন আমেরিকার মাটি দেখা যাওয়ার খবরটা রানি ইসাবেলকে টেলিগ্রাফ করে জানাতে, কিন্তু টেলিগ্রাফ যে এখনও আবিষ্কারই হয়নি ?

উঃ হা ঈশ্বর, সবই কি আমাকেই আবিষ্কার করতে হবে !

প্রঃ সেই যে লোকটার দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছিলে, তার দামটা শেষ পর্যন্ত দিয়েছে ?

উঃ দাম দেবে কী, চাইতে গেলে আমার বাঁধিয়ে দেওয়া দাঁতই খিঁচিয়ে দিচ্ছে।

প্রঃ তুমি কি বলতে পারো, আসামি একা একা নিজের মনে কথা বলত কি না ?

উঃ এটা হুজুর আমার পক্ষে বলা মুশকিল। আসামি একা একা আছে, অথচ আমি তার সঙ্গে আছি, এরকম কোনো সময়ের কথা আমি মনে করতে পারছি না।

সুসেন

হাসিখুশি

এক খবরের কাগজের সম্পাদক রিপোর্টারকে ডেকে বললেন, "আপনি এই খবরটির শিরোনাম দিয়েছেন 'রিকশাচালকের অতুল ঐশ্বর্যলাভ'। অথচ পেয়েছে তো মাত্র তিন হাজার টাকা।"

সবিনয়ে উত্তর দিলেন রির্পোর্টার, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন রিকশাচালকের কাছে ওটাই অতুল ঐশ্বর্য।"

"আচ্ছা মা, সব রূপকথার গল্পই কি 'এক দেশে এক রাজা ছিল' বলে আরম্ভ হয় !"

"না পাপান। 'আজ পেট কামড়াচ্ছে, ইশকুলে যাব না' বলেও শুরু হয় কখনও কখনও।"

মোটর-সাইকেল-আরোহী এক যুবক ধাক্কা মারল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে এবং তাঁকেই চোখ রাঙাতে লাগল রাস্তায় না-দেখে চলার জন্য। ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, "দোষ তো করলেন আপনিই।"

যুবকটি রাগত কণ্ঠে বলল, "জানেন, আমি এ-রাস্তায় দশ বছর মোটর-সাইকেল চালাচ্ছি।"

বৃদ্ধ খুব শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "কিন্তু আমি যে ত্রিশ বছর হাঁটছি এ-রাস্তায়।"

"সবাই তো দেখতে পায় সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়—তবু এটা বইয়ে লেখে কেন ?"

"যারা পূর্ব আর পশ্চিম দিক চেনে না, তাদের জন্য।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

সম্পূর্ণ উপন্যাস

নিশ্চিন্তপুরের রোমাঞ্চ

কঙ্কাবতী দত্ত

শহর ছাড়িয়ে হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে বাস। দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুপাশে সবুজ ধানখেত। হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে ধানের শিষ। সমস্ত খেতটা ঢেউয়ের মতো হাওয়ায় দুলে উঠছে, যেন তার বুকের ভেতর উঠছে-পড়ছে নিশ্বাস।

বাসের পিছুনের সিটে পাশাপাশি বসেছে চুয়া, পূর্ণা, সঞ্জিত আর জোজো। পূর্ণা আর জোজোর মাসতুতো ভাই সঞ্জিত, আর চুয়া তাদের বন্ধু। ইসকুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা সবে শেষ। জীবনে যত কিছু ভাল জিনিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে দারুণ এই শীতের ছুটি। প্রায় প্রতি বছরই পরীক্ষার পর তারা বেড়াতে যায় তাদের মাসির বাড়ি— গঙ্গার উপরে নিশ্চিন্তপুরে। মোহানার মুখে এই গ্রামটি তাদের সবচেয়ে প্রিয় ছুটি কাটাবার জায়গা। তাদের মেজমাসি শান্ত, সুলক্ষণা, ভাল মানুষ আর মেজমেসো দারুণ ডানপিটে।

মেজমাসির পড়াশুনোয় যেমনই মন মেজ মেসো তেমনই ডিগ্রি-টিগ্রির ধার ধারেন না। কোনো কিছুরই ধার ধারেন না, কোনো কিছুকেই পাত্তা দেন না এবং মা, বাবা, দাদাদের দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে এলোমেলো বাউণ্ডুলে জীবনযাপন করেন। বহু কাজ তিনি করেছেন, যা ধরেন তাই দারুণ উতরোয় তাঁর হাতে, কিন্তু মুশকিল হল কোনো চাকরিতেই তাঁর মন টিকত না। অবশেষে একের পর এক চাকরি ছাড়তে ছাড়তে গঙ্গার তীরে নিশ্চিন্তপুরে এসে মেজমেসোর জীবন খুলে গেল। গঙ্গানদীর পলিমাটির সোঁদা গন্ধ আর পরিচ্ছন্ন বাতাস মিলে গেল তাঁর রক্তস্রোতে। এখন মেজমেসো চল্লিশ লক্ষ টাকার মাছ রফতানি করেন, হাওয়াকল বসিয়ে বছরে ফসল তোলেন তিনবার। নিশ্চিন্তপুরে শুধু নদী, আর মাঠই নয়, মাসির হাতের রান্না আর বিশাল বাড়ির আরামও তাদের কম প্রিয় নয়।

ডায়মণ্ডহারবারে এসে বাস থামল। বাসস্টপের সামনেই এক বড়সড় মিষ্টির দোকান। কাউণ্টারে নাদুস-নুদুস চেহারার মালিক সাদা গেঞ্জি আর ধুতি পরে টাকা গুনছে, আর মাঝে-মাঝে 'ওরে জগা' বলে হাঁক দিচ্ছে। ভেতরে বেঞ্চি পাতা, কাউণ্টারের সামনে রাস্তার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পয়সা মেটাচ্ছেন কালো, লম্বা, চশমাপরা এক ভদ্রলোক।

জোজো সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা আড়মোড়া ভাঙল। "তোরা বোস। আমি একটু ঘুরে আসি।" মিষ্টির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় জোজো। বেশ ভিড় দোকানে। ছোকরা বেয়ারা এক হাতে সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে। মিষ্টির দোকানের মালিক গল্প জুড়েছেন চশমাপরা লোকটির সঙ্গে।

"ও, আপনিই তাহলে নতুন বি ডি ও সাহেব ? বাঃ, বেশ, বেশ। এতদিন তো পয়লা নম্বরে কোনো গভ্‌মেণ্ট আপিসই ছিল না।"

"এই এখন আস্তে আস্তে সব হবে আর কি—"

"হাটের ওখানে রাস্তাটা কিন্তু স্যার দেখবেন। ভোটের সময় তো কত শুনলুম— আমি বুঝলেন, কুলপির লোক—"

বি ডি ও সাহেব মৃদু হাসতে হাসতে খুচরো পয়সা পকেটে তোলেন। নিখুঁতভাবে ছাঁটা চুলের নীচে বি ডি ও সাহেবের ঘাড়ে দেখা যাচ্ছে তিনটে ছোট ছোট তিল। তিল অনেকেরই থাকে, কিন্তু এরকম পাশাপাশি সারিবদ্ধ তিনটে তিল কমই দেখা যায়। তার ছোটকাকুর অবশ্য দুটো তিল আছে, বাঁ হাতের কব্জিতে। সেগুলো কিন্তু কালো নয়, লালচে বাদামি।

দোকানের উলটোদিকের টিউবওয়েল থেকে জোজো দু-হাতের অঞ্জলি ভরে জল খেয়ে, শার্টের হাতায় মুখ মুছতে-মুছতে বাসে উঠে গেল।

ডায়মণ্ডহারবারে বেশ কিছু লোক নেমে গেছে। বাস ছাড়তে জোজো স্বরচিত গান ধরল :

ওগো নিশ্চিন্তপুর
হাওয়ায় বাজছে তোমার সুর
আবেশে মধুর

তার গানের তালে তালে হাততালি দিয়ে গলা মেলাল চুয়া—

সেই সাবলীল ছন্দে,
আজকে তোরা মন দে
নদীর ধারের নীলচে হাওয়া
মাতাল ঘাসের গন্ধে—

পূর্ণা ছুঁয়ে দিল, "সকাল থেকে সন্ধে ! ব্রাভো ! দারুণ হয়েছে তো !"

হু-হু করে এগিয়ে চলে বাস। এখন স্পিড প্রায় আশি কিলোমিটার হবে। হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সঞ্জিত দু হাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরল। ভাল লাগছে, বড্ড ভাল লাগছে।

* * *

ধানখেতের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। তাদের পেছন পেছন মাল নিয়ে চলেছে হরেন বৈরাগী, মেজমাসির নির্দেশে যে পয়লা নম্বরের আগের স্টপ বাসন্তী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের বাসে উঠেছে যাতে তারা স্টপ ভুল না করে। মোটা কাপড়ের ফতুয়া আর ধুতি সত্ত্বেও চেহারায় বেশ একটা শৌখিন ভাব। স্পষ্টতই, মেজমাসির প্রিয়পাত্র হরেন বৈরাগী।

চুয়া চোখের উপর হাত দিয়ে দূরের দিকে তাকাল। ওই তো দেখা যাচ্ছে রঙিন পাল। নদীর আগে দেখা যায় নদীতে ভাসমান নৌকোর পাল। ঝড়ের মতো হাওয়া দিচ্ছে। নদী আর পলিমাটির গন্ধমাখা দুরন্ত হাওয়া। নদীর জল খাড়িতে ঢুকে পড়েছে। সেই জলে জেলেদের একটি নৌকো। চুয়া ছুটে গিয়ে খালের ধারে দাঁড়াল। বুড়ো দাড়িওয়ালা মাঝি নৌকোয় বসে জাল বুনছিল। চুয়া হাততালি দিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। "আজ বুঝি নৌকো ছাড়বে না ?"

"ছাড়ব, জোয়ার নামুক।"

"কোথায় যাবে ?"

"যাব গাঙড়া।"

"গাঙড়া ; সে কোথায় ?"

"বারোতলার ঘূর্ণি ছাড়িয়ে।"

সঞ্জিত চুয়াকে টেনে নিয়ে বলল, "চল, চল, ওই দ্যাখ মেজমাসির প্যালেস দেখা যাচ্ছে।"

মেজমেসোর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক কায়দায় বানানো বাড়িটাকে তারা প্যালেস আখ্যা দিয়েছে। সামনে মস্ত লন, আউটহাউস, গ্রিন হাউস, পেছনে সবজিখেত, বড়-বড় গাছ। মেজমাসি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও দেখতে তিনি অতি লাবণ্যময়ী। সদ্যস্নাত বলে লম্বা চুল পিঠের উপর। তাঁর একমাত্র মেয়ে তন্বিষ্ঠা আমেরিকায় পড়াশুনো করছে। মেসোও এক মাসের জন্য আমেরিকায় গেছেন। মাসি গেটের কাছে এগিয়ে এসে তাদের সকলকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। মেজমাসি সেইসব রহস্যময় দুর্লভ মহিলাদের একজন যিনি ছোটদের সঙ্গে একেবারেই ছোটদের মতো ব্যবহার করেন না, সমকক্ষ হয়ে যান। "আয়, ভেতরে আয়— লাঞ্চ তৈরি। রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে আশা করি।"

জোজো ভদ্রতা করে বয়স্ক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, "না, না, তেমন কিছু না—"

বিখ্যাত খাদ্যরসিক জোজোর এহেন উক্তিতে সকলে হোহো করে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

পূর্ণা বলল, "আগে ঘরে যাই মেজমাসি, যা ধুলো লেগেছে, হাত-মুখ ধুয়ে নিই।"

"নিশ্চয়ই, চল, চল, ওপরে চল। নিশিধর, ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে নাও।"

প্রতিবারই তাদের জন্য পাশাপাশি দুটি ঘর সাজানো থাকে। মেজমাসি কোমর থেকে রুপোর চাবির রিঙ দিয়ে ঘরের তালা খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দুটো ঘরই নদীর একেবারে মুখোমুখি, যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। শীতের ঝকঝকে নীল আকাশ, দু-একটা গাঙচিল নদীর নীলচে বেগ্‌নি রঙের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় উড়ছে জানালার পর্দা।

* * *

রুপোর লঙ ডিশে বিশাল-বিশাল লাল-গোলাপি চিংড়ি সোনালি মাখনে চকচক করছে। পাশে ছোট বেতের ঝুড়িতে ভেটকি মাছের ফ্রাই। ধোঁয়া উঠছে। পূর্ণা বলল, "আর এই এসে গেছে আমার ফেভারিট, কড়াইশুঁটির পোলাউ। পোলাউয়ের মধ্যে আবার লুডোর ছক্কার মতো চৌকো-চৌকো ছানাভাজা।"

"বাপ রে বাপ, অত কী করে খাব," বলতে বলতে সঞ্জিত ঘাড় ঘুরিয়ে বিস্ফারিত নয়নে দেখল জার্মান সিলভারের ট্রেতে রোস্ট ডাক নিয়ে আসছে লক্ষ্মণ। দুপাশে গোল-গোল নতুন আলু আর প্রচুর কড়াইশুঁটি-সেদ্ধ। জোজো কালবিলম্ব না করে চার-পাঁচটা ফিশ ফ্রাই প্লেটে তুলে নিল। আঃ, গ্র্যাণ্ড !

চুয়া হাঁসের ঝলসানো-মাংসে দাঁত বসিয়ে বলল, "মেজমাসি, তুমি বসবে না ?"

কাচের বাটিতে ফ্রুট স্যালাড তুলতে তুলতে মেজমাসি বললেন, "একটু পরে বসব রে। তোর মেসোমশাইয়ের এক বন্ধুর ছেলে তার বন্ধুকে নিয়ে এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে। ওদের জন্য অপেক্ষা করছি।"

পূর্ণা বলল, "আরেব্বাস, বাড়ি তো তাহলে ভর্তি।" গলদাচিংড়ির টুকরো মুখে তুলল সে। এত নরম যে মুখের মধ্যে যেন প্রায় গলে যায়। "আঃ, চিংড়িটা যা হয়েছে না, অপূর্ব !" সে বলে।

এই সময় দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল দুটি যুবক। দুজনেরই বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, একজন ফর্সা, লম্বা, চোখে পুরু কালো চশমা। মুখে শিশুর মতো সরল হাসি। অন্যজনের চমৎকার স্বাস্থ্য, লম্বা-চওড়া, কপালের কাছে একটা ছোট কাটা দাগ।

মেজমাসি পরিচয় করালেন, "এসো রণজয়। দেখো আমার বোনপো বোনঝিরা এসে গেছে। কী প্রবীর, খিদে-টিদে পেয়েছে তো ? নাকি ছবি এঁকেই পেট ভরে গেছে ?"

চুয়া চোখ তুলে তাকাল। সে খুব ছবিপাগল। সে ঠিক করেছে বড় হয়ে ছবি আঁকবে।

"আপনি ছবি আঁকেন ?"

"হুঁ।"

প্রবীরের সংক্ষিপ্ত উত্তরে একটু অপ্রস্তুত হয়ে রণজয় বলল, "বল্ প্রবীর, এখন কী আঁকছিস বল্।"

তবু সে নিরুত্তর দেখে সে নিজেই বলতে থাকল, "ও বড্ড খেয়ালি। শিল্পীরা যা হয় আর কি। নদীর ধারের কিছু দৃশ্য আঁকবে বলেছিল তাই বললাম চল্ এমন জায়গায় নিয়ে যাব দেখলে ভুলতে পারবি না। ভ্যান গগ যেমন সাউথ অব ফ্রান্সে গিয়ে নৌকোর ছবি, নদীর ছবি আঁকেতন, তুই সাউথ অব বেঙ্গলে গিয়ে আঁক— তাতে যদি তোর কিছু হয়— হাঃ হাঃ !"

বিপুল খাওয়ার পর সকলেরই একটু অলস লাগছিল, ওঠাও হয়েছে সেই ভোর চারটেতে। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্তপুরে এসেও তো আর দুপুরে ঘুমোনো যায় না। তারা মাসির খাওয়া হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বাগানে গিয়ে সকলে মিলে বসল বেতের চেয়ারে নদীর দিকে মুখ করে।

মাসি বললেন, "এবার বল, খবর বল— জোজো কি এবারেও ফার্স্ট হবি নাকি ? অন্যদেরও একটা চান্স দে।"

জোজো বললে, "খুব একটা ভাল হয়নি পরীক্ষা— তবে ফার্স্ট হওয়ার মতো ক্লাসে তো আর কেউ নেই।"

সঞ্জিত হেসে ফেলল, "আর বিনয়ধর্মেও তুই আমাদের মধ্যে ফার্স্ট—"

পূর্ণা বলল, "জোজো যে কী করে ফার্স্ট হয় বুঝি না। আমি তো কত চেষ্টা করি— ও তো পড়েই না।"

জোজো মুচকি-মুচকি হেসে বলে, "পড়লেই তো হয় না—" মাথায় টোকা মারে দু আঙুলে।

পূর্ণা রাগের চোটে দুম করে এক কিল মারল তার পিঠে, আর তখনই একটা তীর এসে সোজা বিঁধল তাদের সামনের গাছে।

সকলে চমকে উঠে দাঁড়াতেই দেখে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় গ্রাম্য-বন্ধু কালো। পিঠে ঝুলছে ধনুক। এই শীতেও ঘামে চকচক করছে তার গা। সমস্ত দাঁত বের করে সে হাসছে।

"কালো—কালো—কালো," সকলে মিলে চেঁচিয়ে ওঠে।

"এতক্ষণে এলি ?"

"শিগগির যাবে তো চলো, ডিঙি বেঁধে এসেছি।"

"কোথায় ?"

"বাঃ, নদীর ধারে যাবে না ? এখানে বসে থাকলে হবে ?"

মেজমাসির সহাস্য অনুমোদন নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যেকের পরনে মোটা জিনিস, রঙিন সোয়েটার আর নাইলনের উইণ্ড চিটার।

মাথায় রঙিন সিল্কের রুমাল বাঁধতে বাঁধতে চুয়া বলে, "কালো, এই শীতেও তুই খালি গা ? তুই মানুষ না ভূত ?"

কালো হাসিমুখে বলে, "আমি ভূত।" বলে চোখ বড় বড় করে চুয়াকে ভয় দেখানোর ভঙ্গি করল, "হাঁউ মাউ খাঁউ—"

চুয়া তার পিঠে এক ঘুসি মেরে বলল, "গাধা কোথাকার ! তোর খবর কী ? মেজোমাসি বলল তুই নাকি খুব খাটছিস ?"

কালো গম্ভীরভাবে ঘাড় কাত করে বলল, "ও কথা উপস্থিত থাক।"

ওর আকস্মিক গাম্ভীর্যে সবাই হেসে ফেলল।

কালো বলল, "চল গাঙের ধারে যাওয়া যাক। সাথে চিঁড়াভাজা নিয়ে এসেছি। তাও খাব দু'গাল, হাওয়াও খাব। সত্যি খুব খাটুনি যাচ্ছে—আজ তো পালিয়ে এসেছি।"

সঞ্জিত ভুরু কুঁচকোল, "কেন ?"

"লৌকায় কাজ নিয়েছি যে—"

নদীর একদম কিনারায় এসে বসেছে তারা। সার সার নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। সামনে প্রশস্ত গঙ্গা। দূরবিনটা থাকলে তারা দেখতে পেত ডানদিকে আওনমারি আর বাঁদিকে ঘোড়ামারির চর। ঐ চরে কোনো লোক থাকে না। অন্ধকার নামলে নদীর ওপারে জ্বলবে হলদিয়া বন্দরের আলো।

জোজো বলল, "কালো, নৌকা চড়বি না ?"

কালো একমুঠো চিঁড়ে মুখে পুরে গম্ভীরভাবে বলল, "না।"

জোজো অনুযোগের সুরে বলল, "কেন ? কেন ? প্রতিবার তো চড়ি।"

"এখন তিনদিন এখানকার কোনো নৌকো মাছ ধরতে বেরুবে না। বাইরের লোক তো মোটে তুলবেই না।"

সঞ্জিত ভুরু তুলল, "কেন ?"

"সব নৌকো তিনদিনের জন্য ভাড়া হয়ে গেছে।"

"সে কী ! এত নৌকো, সব ভাড়া হয়ে গেছে ?"

কোলের উপর পড়ে থাকা দু'তিনটে চিঁড়ের দানা টুসকি দিয়ে ঝেড়ে বলল, "মাত্র তিনদিনের জন্য। তারপর তো বাবুরা চলেই যাবে। আমি নিজেই তোদের নিয়ে যাব। জানিস তো বাবুরা ঐ বুড়ো রামানারায়ণবাবুর নাতির বন্ধু। ঐ বাড়িতেই তো উঠেছে। কত তাদের বায়নাক্কা—এই গরম জল চাই, এই সোডা চাই—এখানে কোথায় পাব ? সেই কাকদ্বীপ থেকে আনতে হল। তাও সোডার বোতল খুলে দেখে একজন বাবু ভেজাল বলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।"

চুয়া উত্তেজিত হয়ে নিজের হাতের পাতায় ঘুসি মেরে বলল, "ভীষণ পাজি তো !"

ঘাসের উপর শুয়ে পড়তে পড়তে কালো বলল, "না রে পাজি না। বাবুরা আমাকে কত কিছু দেয়। এই দ্যাখো না—" কোঁচড় থেকে রাংতা-মোড়া চকচকে একটা জিনিস বার করল কালো।

পূর্ণার চোখ চকচক করে উঠল। "চকোলেট ! বিলিতি

চকোলেট ! দেখি, দেখি ।"

ছোট্ট গোল চকোলেটটা পূর্ণা হাতের তালুতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল । টুকটুকে লালের মধ্যে সাদা বুটি-দেওয়া রাংতা-মোড়া চাকতিটি রোদ্দুরে চকচক করছে ।

কালো বলল, "খাই না—রেখে দি । গতবার কী পেয়েছিলাম জানো । এইটুকু একটা রেডিও—ট্রানজিসটার । সত্যি ! একদিন দেখাব ।" কালো কোঁচড় থেকে একটা ভাঙা বাঁশি বার করে আলতোভাবে ফুঁ দিল ।

সঞ্জিত বলল, "তুই তাহলে আজকাল হিন্দি সিনেমার গান অনেক শিখেছিস বল্ ? আগে তো শুধু ঐ গাঁইয়া গানগুলোই গাইতিস ।"

পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, "কালোর গানকে তুই গাঁইয়া বলছিস । আমার তো হেভি লাগে ! একটা গা না কালো, সেই যে তুই যেটা খুব ভালবাসিস, গোষ্ঠ বাউলের না কার যেন ? এখনো এল না কালিয়া—"

এই সময় একটা নৌকোর ছইয়ের ভেতর থেকে এক বুড়ো মাঝি বেরিয়ে এল । শীর্ণ, পাকানো চেহারা, পরনে গেঞ্জি আর আদ্যিকালের পুরনো একটা লুঙ্গি । তাকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল কালো ।

"এই ছোঁড়া, তোকে বলেছি না নৌকো ছেড়ে বাইরে না যেতে । চলে আয়—অত গান-বাজনা করতে হবে না ।"

কালো মুখ তুলে ঠাণ্ডাভাবে বুড়ো মাঝির দিকে তাকাল । তার সমস্ত ভঙ্গিতে এমন একটা ঔদ্ধত্য আর আত্মবিশ্বাস ছিল যে মনে হল তার সমস্ত শরীরটা বলছে, ও, আমাকে বারণ করা হচ্ছে, এখন তো তাহলে কোনো উপায় রইল না—গান আমায় গাইতেই হবে । কিন্তু সে গান গাইল না, আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিল । জোজো চুয়ার পিঠে হাত রাখল । "চল্, চুয়া যাওয়া যাক ।" বুড়ো মাঝি নৌকোর উপর থেকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে বলল, "এখানে কী চাই ?" হিমশীতল দৃষ্টিতে তাদের পর্যবেক্ষণ করল ।"এখান থেকে যাও ।"

যথার্থ দাদাসুলভ ভঙ্গিতে সঞ্জিত বীরদর্পে দু-কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে এল । "আমরা কেন যাব, অ্যাঁ ? এটা কি তোমার প্রাইভেট প্রপার্টি নাকি ?" কিন্তু বৃদ্ধ মাঝির মুখের দিকে তাকাতে কী যেন থেমে গেল তার মধ্যে । মাঝির চোখদুটো যেন কাঠের মতো স্থির, কনকনে । পলক প্রায় পড়ছে না বললেই চলে । মুখের, কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে । হাওয়ায় অল্প-অল্প উড়ছে কয়েক গুচ্ছ সাদা চুল । সঞ্জিত আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিল । "মানে এটা তো আপনার প্রাইভেট জায়গা না । তাছাড়া আমরা কালোর বন্ধু ।"

সঞ্জিতের গলার মিইয়ে-যাওয়া ভাবেই সম্ভবত ক্ষীণ একটি হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে । সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, "কদিন পরে এসো । বহুত গান শোনাবে । আজ না ।"

তার কথা শেষ হতে না হতে কালো দু-হাতে বাঁশিটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে ফুঁ দিল । সুরের এক অপূর্ব মায়াজাল হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল ।

আকাশের সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, প্রতিটি গাছ ও ঘাসের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেল সেই সুর । সমস্ত নিসর্গটা একটা নতুন আলোয় ঝঙ্কৃত হতে লাগল চুয়ার বুকের মধ্যে । নদীর মধ্যে এখন একটা ভয়াবহ উপাদান লক্ষ করা যাচ্ছে । জলটা কোথাও কোথাও কালচে ছাইরঙ, কোথাও বা লেখার কালির মতো, কোথাও বেগুনি । মনে হয় তারা যেন অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়েছে । প্রকৃতির এই বিপুলতার সামনে দাঁড়িয়ে চারটি বালক-বালিকার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ।

ঘন কালো নীল আকাশের গায়ে আলোর একটি উজ্জ্বল বিন্দুর মতো মেজমাসির বাড়ি । গেটের উপর ঝুঁকে-পড়া গুচ্ছ-গুচ্ছ মাধবীলতা হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে । গেটের কাছাকাছি আসতে একজন পুরুষের উঁচু ভাঙা-ভাঙা হাসি কানে এল । আরো দু-একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের টুকরো-টুকরো কথা, হাসি ভেসে আসছে সুগন্ধি হাওয়ায় । বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে আরো তিনজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে চায়ের আসর বসিয়েছেন মেজমাসি । ঈষৎ ভারী, ফর্সা চেহারার এক ভদ্রলোক মেজমাসির মুখোমুখি বসে । চওড়া নাক, বড়-বড় চোখ, মাথার চুল খুব পাতলা, পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পাজামা । অন্য একটি চেয়ারে বসে আছে শ্যামলা মিষ্টি চেহারায় এক মহিলা, আর অন্যজন হচ্ছেন কালো, ছিপছিপে, চশমা-পরা এক ভদ্রলোক ।

"এই যে শ্রীমান-শ্রীমতীরা এসে গেছেন । সন্ধ্যার পর একদম বাইরে থাকবি না বলে দিলাম···এই, এদের কথাই বলছিলাম । কীভাবে এদের জন্য অপেক্ষা করে থাকি । এই তো ক'দিন পরে চলে যাবে, আমার বাড়িও খালি । জোজো, চুয়া, সঞ্জু, পুন্নি—এই যে ইনি হলেন আমাদের নতুন বি ডি ও সাহেব রবীন চন্দ, আর ইনি কমলদি, আমাদের এখানকার প্রাইমারি ইসকুলে পড়াতে এসেছেন—আর সীতেশবাবু হলেন, কী বলব, সোস্যাল ওয়ার্কার বা সমাজসেবক ।" মাসির ঠোঁটের কোণে একটা কৌতুকের হাসি ফুটল । "সীতেশবাবু একটা সোস্যাল্ ওয়েলফেয়ার প্রতিষ্ঠান থেকে আসছেন । একমাস এখানে থাকবেন । নানা জায়গা থেকে এইড নিয়ে গ্রামের মানুষকে হেল্প্ করেন ।"

সীতেশবাবু চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন । "হেল্প্ করি কি না জানি না । করার চেষ্টা অন্তত করি । হেঃ হেঃ—"

জোজো একটু কৌতূহল নিয়ে বি ডি ও সাহেবকে দেখল । পেছন থেকে দেখা আর সামনে থেকে দেখায় কত তফাত । এখন একদম অন্যরকম লাগছে—গায়ে সেই একই সবুজ রঙের সোয়েটার, ডায়মণ্ডহারবারে যেমন দেখেছিল ।

এই সময় গেটে টুং করে শব্দ হল । রণজয় আর প্রবীর আসছে । রণজয়ের কাঁধে ক্যামেরা, প্রবীরের গায়ে সাদা পুলওভার আর কেড্স্ জুতো । মোটেও ছবি-আঁকিয়েদের মতো দেখাচ্ছে না তাকে । রণজয় বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, "উফ্, হোয়াট আ ডে ! যা হেঁটেছি না !"

প্রবীর একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল, "বাঃ ! চা রেডি ! গ্র্যাণ্ড !"

বারান্দায় চায়ের আড্ডা এখন জমজমাট । বসার আর একটি আসনও খালি নেই । নিশিধরদা নতুন পটে চা দিয়ে গেছে, আর তাদের জন্য চকোলেট-মেশানো দুধ । সঙ্গে পেস্তা কিশমিশ দেওয়া গরম-গরম মাংসের শিঙাড়া । কালো আর সেই বৃদ্ধ মাঝির কথা এখন তারা ভুলে গেছে ।

রাত্রে মেজমাসিকে টেবিল সাজাতে সাহায্য করল তারা চারজন । টেবিলের তিনপ্রান্তে বসাল তিনটি মোটা রঙিন

মোমবাতি যা কলকাতা থেকে উপহার এসেছে। একটা, ঘন বেগুনি, একটা হলুদ, আর একটা টুকটুকে লাল। মোমবাতির মাঝে মাঝে চকচকে পেতলের ফুলদানিতে রাখল দুটি করে গোলাপের কুঁড়ি, আর টেবিলের মাঝখানে গর্বিত রাজকন্যার মতো একটি মস্ত স্যালাড কাঠের বারকোষে। স্যালাডের উপর সাদা সস আর তেল ঢালতে ঢালতে মেজমাসি বললেন, "লক্ষ্মীসোনা, একটা কাজ করো, রণজয় আর প্রবীরকে ডেকে আনো। বলো খাবার দেওয়া হয়েছে, যা ঠাণ্ডা পড়েছে, গরম গরম না খেলে নার্গিস কোপ্তার কোনো স্বাদই পাবে না।"

চুয়া একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। "ওকে মেজমাসি।" দোতলার করিডোরে পরপর চারখানা ঘর। ডানদিকের একটা ঘর ছেড়ে দ্বিতীয়টিতে প্রবীররা আছে। দুই বন্ধু নিজের মনেই থাকে, চা বা খাবার সময় ছাড়া তাদের সাড়া পাওয়া যায় না। ভেজানো দরজায় টোকা দিয়ে আস্তে দরজা ঠেলে খুলল চুয়া। কিছু না বলেকয়ে হুট করে একজনের ঘরে ঢোকা নাকি খুব অসভ্যতা। চুয়া দোনামোনা করতে করতে মাথা গলিয়ে বলল, "আসতে পারি?" বলতে বলতে বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ে গেল। বাথরুমের কোণের ছোট জানলা দিয়ে প্রবীরদা আর রণজয়দা কী যেন দেখছেন। প্রবীরদার হাতে একটা বাইনোকুলার। চুয়া একবার কাসল, কিন্তু ওঁরা শুনতে পেলেন না। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে চুয়া দেখতে পেল একটি মাঝারি আকারের কালচে-সবুজ স্যুটকেস, কিছু জামাকাপড় এদিক-ওদিক ছড়ানো। কয়েকটা ইংরিজি পেপারব্যাক, রণজয়দার ক্যামেরা—এইসব। ছবি আঁকার কোনো সরঞ্জাম নেই কোথাও। ছবি আঁকতেই যদি প্রবীরদা এসে থাকেন তাহলে ছবি কোথায়? চুয়া গলা তুলে ডাকল, "রণজয়দা।"

এক ঝটকায় মুখ ঘোরাল রণজয় আর প্রবীর। দুজনের চোখেই যেন রাগের বিদ্যুৎ খেলে গেল, স্পষ্ট বুঝতে পারল চুয়া। তারপর একটু বোকা অপ্রস্তুত হাসি হেসে রণজয় বলল, "কী খুকু? এসো, বোসো।"

বিরক্তিতে চুয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। "বসব কেন? আপনারা নীচে আসুন। মেজমাসি খেতে ডাকছেন। আর আমার নাম দামিনী।" বলেই এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চুয়া। খুকু! খুকু-ডাকা লোকগুলো খুব খারাপ হয়, সে জানে। মনে মনে সে একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে ওই রণজয়দাকে তার আর কোনোদিন ভাল লাগবে না।

নীচে নামার আগে সিঁড়ির জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল চুয়া। নদীর ধারের জনহীন প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বাঁশগাছের মাথাগুলি হাওয়ায় দুলছে। কী দেখে ওরা অমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল কে জানে।

রাতের বিপুল আহারের পর নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে চোখ জুড়ে এল তাদের। এক ঘরে শুয়েছে পূর্ণা আর চুয়া, পাশের ঘরে সঞ্জু আর জোজো। জোজো নরম রাজস্থানী লেপটি গায়ে জড়িয়ে নিল। জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। একটা চকরাবকরা কারুকার্য সৃষ্টি হয়েছে ঘরের মেঝেতে। হাওয়ার একটানা শনশন শব্দ ঘুমপাড়ানি গানের কাজ করছে। দূর থেকে খুব মৃদু একটা জাহাজের ভোঁ কানে এল। জোজো পাশ ফিরে শুল। মোটরগাড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন সম্পর্কে তার উৎসাহ অসম্ভব।

"সঞ্জু।"

"উঁ-উঁ।"

"জাহাজের ভেঁপু বলে মনে হল না?"

"উমম্।"

বিদেশী জাহাজ নাকি আজকাল সচরাচর এখান দিয়ে যায় না। সাধারণত হলদিয়া ঘেঁষে যায়। মেজমেসো বলেন, ভাল লাইটহাউসের অভাবে এখান দিয়ে জাহাজ যেতে পারে না। এই প্রথম সে এত রাতে জাহাজের সাড়া পেল এখানে।

পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমের মসৃণ কুয়াশায় হারিয়ে যেতে যেতে অন্য একটা শব্দ আবছাভাবে জোজোর কানে এল। কার জুতো-পরা-পা আস্তে আস্তে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসছে। সিঁড়ির মুখে থামল। তারপর প্রায় নিঃশব্দে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জোজো ঘুমের মধ্যে চিত হয়ে শুল। ততক্ষণে সে স্বপ্ন দেখছে তাদের ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই একটা নীল আর সাদা রঙের জাহাজের ডেকে জাল হাতে গাঙচিল ধরার চেষ্টা করছেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের হাতে তিন-তিনটে তিল!

* * *

"অ্যাই পূর্ণা! বড্ড স্রোত রে! অত দূরে যাস না।"

"কেন যাব না? তোদের মধ্যে আমি বেস্ট সাঁতার কাটি। এই দ্যাখ—" বলতে বলতে কয়েক হাত সাঁতরে এগিয়ে গেল পূর্ণা। এবারে সে সঞ্জিতের নাগালের বাইরে। এতক্ষণ সঞ্জিত জলের তলা দিয়ে ডুবসাঁতার কেটে এসে তার পিঠে চিমটি কেটে হাঙরের ভয় দেখাচ্ছিল। প্রথমবার হঠাৎ সঞ্জিতের ঠাণ্ডা হাতটা পিঠের উপর এসে পড়ায় আঁ আঁ আঁ···ইঁ ইঁ ইঁ করে সে কী চিৎকার পূর্ণার। অন্যরা তো হেসেই খুন। চুয়া তার দিকে একটা মস্ত বড় প্লাস্টিকের বল ছুঁড়ে দিল। লাল-নীল ডোরা-কাটা বলটি নীল আকাশের পটভূমিতে ঘুরতে-ঘুরতে খপ্ করে এসে জলের উপর পড়ল। পূর্ণা ছুটতে-ছুটতে জল ছিটিয়ে এসে বলটা ধরতে যাবে, এমন সময় পায়ে কী একটা শক্ত জিনিস ঠেকায় সে হোঁচট খেল। "উফ্! বাপ্ রে!"

সঞ্জিত এগিয়ে এসে বলল, "কী হল পুন্নি? হাঙর নাকি? বলিস তো ঘাড় মটকে দিই।"

একটু দূরে নৌকোর গলুইয়ে বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে চিংড়ির জাল বুনছিল কালো। তার বাবা এবং ঠাকুর্দা দুজনেই ছিল গাঁয়ের সেরা মাঝি। চার বছর বয়স থেকে সে বাবার সঙ্গে ডিঙি করে মোহানায় মায় সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। জলের জীবন বড় বিপজ্জনক, নিরাপত্তাহীন, কিন্তু বিপদেই তো আছে পাগল করা দুর্নিবার আকর্ষণ। তার কয়েক হাত দূরেই চারটি ছেলেমেয়ে জলে খেলছে রঙিন বল নিয়ে। দেখেও দেখেনি কালো। চিনামাঝি বলেছে আর তিনদিন বাদেই সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে, কিন্তু এই তিন দিন তাকে নৌকোতেই থাকতে হবে, কোথাও যাওয়া চলবে না। হঠাৎ পূর্ণার চিৎকার কানে যেতে চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে চিনামাঝির নির্দেশ ভুলে জলে ঝাঁপ দিয়ে এক ডুবে পূর্ণার কাছে এসে পৌঁছল।

পূর্ণা পা চেপে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর অন্য তিনজন একটা ভারী জিনিস জল থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। কালোকে দেখে তারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। জোজো বলল, "দেখো তো কী, একটা বেশ বড় চৌকো বাক্স মনে হচ্ছে—কাদায় গাঁথা ছিল।"

কালো হাত লাগাতে বাক্সটা তুলতে সময় লাগল না। মাঝারি আকারের কাঠের প্যাকিং বাক্স সম্পূর্ণভাবে সিল করা। কালো বাক্সটা দু-হাতে তুলে বলল, "পাড়ের কাছে নে যাই ?" সঞ্জিত নদীর নির্জন পাড়টাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

জোজো বলল, "নদীর পাড়ে বাক্স খোলা চলবে না।"

"কেন ?" ভুরু তুলল পূর্ণা।

"আমরা জানি না বাক্সটার ভেতর কী আছে।"

কালো বলল, "বুড়ো দেখতে পেলে এখুনি ছুটে আসবে। চলো ওই বি ডি ও সাহেবের কোয়ার্টারে যাই।"

সকলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, ইঁটের গাঁথনি দিয়ে একটা পাকা ঘর উঠছে। ওপরটা টালির চাল। প্লাস্টার বা রঙ এখনো হয়নি। কালো বলল, "বাড়ি এখনো তৈরি হয়নি। এখন কাজ বন্ধ আছে। সাহেব অফিসেই উঠেছে।"

জোজোর পকেটে সব সময় থাকে একটা ন-ফলা ছুরি যা তার কাকা জার্মানি থেকে উপহার এনেছিলেন। সেই ছুরি দিয়ে চাড় মেরে বাক্স খোলার চেষ্টা হতে লাগল। কালো খুলতে লাগল একটা একটা করে পেরেক।

অবশেষে একটি দিক ফাঁক হল।

"ওয়াও ! হুররে।" সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাক্সের উপর। উপর দিকটা খড় আর ছোট-ছোট স্পঞ্জের টুকরো দিয়ে প্যাক করা আছে। প্যাকিংয়ের ফাঁক দিয়ে চকচক করছে কী যেন। জোজো একটা চৌকো প্লাস্টিকের জিনিস টেনে বার করল। এই জিনিসের লাইব্রেরিতে এখন ছেয়ে গেছে কলকাতা।

"বিদেশী ভিডিও ক্যাসেট।" জোজো গম্ভীর ভাবে বলে।

বাক্সে থরে থরে সাজানো আছে ক্যাসেট, ফিল্ম, ঘড়ি, ক্যামেরা, আরো কত কী। সঞ্জিত একটা বিদেশী সানগ্লাস বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। "আরেব্বাস !"

পূর্ণা চিন্তিতভাবে বলে, "এগুলো নিয়ে এখন কী করব আমরা ? মেজমাসিকে কিন্তু বলা উচিত।"

"চুপ কর তো।" জোজো খিঁচিয়ে ওঠে। "এর মধ্যে ব্যাপার আছে—স্মাগলিং চলছে। আমাদের রহস্য ভেদ করতে হবে।"

"স্মাগলিং চলছে !" এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনেই বেশ চনমন করে উঠল। দেখা গেল কালোও শব্দটি জানে।

দ্রুত হাতে সব জিনিস বাক্সে ঢুকিয়ে তারা ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এসে একটা মাটির গর্তে ফেলে মাটি আর ডালপালা চাপা দিয়ে রাখল। জোজো বলল, "আমাদের একটা প্ল্যান সব অ্যাকশন ঠিক করতে হবে। কালো, আজ আর এদিকে আসা হবে না, কাল তুই আসবি তো ? ঠিক এই সময়ে।"

* * *

আলু-ফুলকপির ডালনা, কড়াইশুঁটি দিয়ে মুগডাল, ইলিশমাছ-ভাজা, তেল-কই আর ঝাল মুরগির মাংস। এরপর জীবনে আর চাইবার কী থাকতে পারে। মেজমাসির রান্না তাদের উত্তেজনা সাময়িকভাবে অন্য খাতে বইয়ে দিল। দুপুরে সকলেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিকেলে উঠে দেখে জানলার বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। শীতের বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, কনকনে হাওয়া। জোজোর পকেট থেকে বেরুল একটা তাসের প্যাকেট, মেজমাসি পাঠিয়ে দিলেন গরম চকোলেট আর

চিজ-টোস্ট। নরম লেপের তলায় পা ডুবিয়ে তাস খেলতে খেলতে শুনল নীচে লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। জোজো তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নেমে বলল, "চল্, চল্ দেখি কী ব্যাপার। আমাদের বাক্সটা কেউ খুঁজে পায়নি তো আবার!"

সকলে দুড়দাড় করে নীচে নেমে দেখে প্রবীরদা ভুরু কুঁচকে একটা পত্রিকা পড়ছেন। একটু দূরে একটা মোড়ায় বসে বি ডি ও রবীনবাবু টেলিফোন ডায়াল করছেন। এ তল্লাটে এই একটাই টেলিফোন! সকলেই এটা ব্যবহার করে।

রবীনবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে হাসলেন। "উফ্, লাইন কিছুতে পাচ্ছি না। যাও, যাও তোমরা, চা দিয়েছেন টেবিলে বোধহয় সুনন্দাদি।"

প্রবীর মুখের সামনে থেকে পত্রিকা সরিয়ে বলল, "খুব জরুরি কাজ ছিল নাকি?"

রবীনবাবু রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন, "হ্যাঁ। তা জরুরি বই কি। ঝড়টড় আসতে পারে—হেড অফিসে কিছু ইন্সট্রাকশন নেওয়ার ছিল। বুঝতেই পারছেন ডিউটি ইজ ডিউটি।" বলতে বলতে ঠোঁটদুটো একটি সংক্ষিপ্ত হাসিতে ফাঁক হলেও পরমুহূর্তেই চিন্তার ভাঁজে কুঁচকে গেল কপাল। হাত নেড়ে বললেন, "যান, যান আপনারা খাবার ঘরে, সুনন্দাদি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছেন।"

ঈষৎ গোলাপি, তাতে হালকা-নীল বেগুনি ফুল-আঁকা কাপে চা ছেঁকে মেজমাসি বললেন, "জোজুয়া, যা তো রবীনবাবুকে চাটা দিয়ে আয়।" জোজো চায়ের কাপ নিয়ে বসার ঘরের দিকে পা বাড়াল। খাবার ঘরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছেন রবীনবাবু।খুব নিচুগলায় কথা বলছেন। যাক, লাইন পেয়েছেন তাহলে! কালো, লম্বা, চোখে চশমা, ঘাড়টা বাঁ দিকে ঈষৎ হেলানো ঠিক এইভাবেই জোজো তাঁকে দেখেছিল ডায়মণ্ডহারবারের বাসস্টপে। ঠিক এই শার্টটাই গায়ে ছিল। কিন্তু সেদিন কত অন্যরকম লাগছিল। জোজো রবীনবাবুর পেছনে এসে দাঁড়াল।

"আপনার চা।"

জোজোর গলা পেয়ে চমকে রবীনবাবু পেছন ফিরলেন। "নাঃ, চা আর খাব না। এখুনি যেতে হবে। সাইক্লোন আসছে শুনলাম। সবাইকে বলতে হবে আজ একেবারে বাইরে না যেতে, বিশেষত নদীর ধারে। যাই, গ্রামের লোকদের সাবধান করে দিই। আর হ্যাঁ, সুনন্দাদিকেও বোলো তো নিশিধরকে পাঠিয়ে একটু ঘরে ঘরে খবরটা পৌঁছে দিতে। গ্রামের লোক তো আবার এ বাড়ির মুখ থেকে খবর না পেলে বিশ্বাস করে না।" রবীনবাবু চা না খেয়ে তড়িঘড়ি চলে গেলেন।

* * *

রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না চুয়ার। আজকে সাইক্লোনের ভয়ে মাসি ওদের এক পাও বাড়ি থেকে বার হতে দেননি। বাক্সটা যথাস্থানে আছে কিনা তাও দেখে আসা হয়নি। কালো কাল আসতে পারবে কিনা কে জানে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল চুয়া। বৃষ্টি থেমে গেছে, ঝড়ের আভাসও নেই। এরকম রাতে সকলে মিলে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। গা থেকে লেপ সরিয়ে চুয়া জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। নদীর ঘন কালো জল দেখা যাচ্ছে না। অল্প-অল্প কুয়াশা পড়েছে দিগন্তে। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত আলোর ঝলক দেখে চুয়ার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল। খুব উজ্জ্বল, উগ্র একটা আলো কেউ জ্বালাচ্ছে, নেবাচ্ছে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। আলোর উৎসটা অনেকটা টর্চের মতোই হবে, শুধু সাধারণ টর্চের চেয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য বা তেজ অনেক বেশি। আলো জ্বলল-নিবল, জ্বলল-জ্বলল নিবল-নিবল জ্বলল এইভাবে যেন কেউ কোনো বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে এমন কাউকে যে আছে নদীতে। চুয়া একবার পূর্ণার দিকে তাকাল—উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন। না, ওকে ডাকা ঠিক হবে না—ও ঠিক ভয় পেয়ে মেজমাসিকে ডাকতে ছুটবে। চুয়া পা টিপে টিপে জোজো-সঞ্জিতের ঘরে ঢুকল দুই ঘরের মাঝের খোলা দরজা দিয়ে। সঞ্জিতটা ঘুমকাতুরে হলেও জোজোর ঘুমটা পাতলা। দুবার কাঁধ ঝাঁকাতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

"ক্কী? কী হয়েছে?"

চুয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ্‌শ্‌শ্। চুপ। আমাদের ঘরে আয়। সঞ্জিতকেও ডাক।"

তিনজনে যখন জানালার সামনে এসে দাঁড়াল তখন কিন্তু সেই টর্চের বার্তা আর দেখা গেল না, বদলে মনে হল জ্বলছে বেশ কিছু নৌকোর টিমটিমে আলো।

জোজো ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "এ নির্ঘাত সেই স্মাগলারদের দল। চল সঞ্জিত—চুয়া, তুমি থাকো। এটা মেয়েদের ব্যাপার নয়।"

চুয়া জোজোর কথায় কান না দিয়ে তাদের পেছন পেছন বেরিয়ে এল। আকাশ পরিষ্কার বৃষ্টির পরে, তারা দেখা যাচ্ছে, চাঁদের আলো এসে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। মধ্যে-মধ্যে বাঁশঝাড়, আর অশোকগাছের কালো রেখা। চলতে চলতে তারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ইস্কুল-বাড়ির পাশ দিয়ে কে যেন ত্রস্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। মাঝারি উচ্চতা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, গায়ে একটা মোটা শাল।

চুয়া জোজোর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "কে রে?"

"চিনতে পারলি না? আমাদের সোস্যাল ওয়ার্কার সীতেশবাবু।" —সীতেশবাবু আল দিয়ে দ্রুত নেমে মিলিয়ে গেছেন।

চুয়া শীতে জড়সড় হয়ে জোজোর দিকে ফিরে বলল, "কী ব্যাপার?"

"চুপ। কিছু শুনতে পাচ্ছিস?"

চুয়া আর সঞ্জিত কান পেতে শুনল, হাওয়ার শনশন শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে কী? হ্যাঁ। ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক কানে আসছে। মাঝে মাঝে জলের ছলাত-ছলাত শব্দ। গাছের পাতার শরশর আওয়াজ। হুঁ, তার মধ্যে দিয়ে যেন মৃদুভাবে ভেসে আসছে মানুষের গলার স্বর, তর্কাতর্কির আভাস।

চুয়া উত্তেজিত হয়ে বলল, "কালোর গলা!"

"দূর, কালোর নৌকো তো অন্যদিকে, চল, আর একটু এগোনো যাক। আমি আর সঞ্জিত যাব। চুয়া বাড়ি যাবে। আর চুয়া যদি বাড়ি না যায় তাহলে আমরা কেউই যাব না।"

জোজোর গলার স্বরের দৃঢ়তাতেই বোধহয় চুয়ার মতো জেদি মেয়েও বাড়ি যেতে রাজি হল। তাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করতে বলে সঞ্জিত আর জোজো এগোল।

কাঁটাঝোপ সরিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সঞ্জিত। দূরে মেঘডাকার মতো কিসের গুড়গুড় শব্দ শোনা

যাচ্ছে। আস্তে আস্তে জোরদার হচ্ছে শব্দটা। সে আলতো করে জোজোর কাঁধে হাত রেখে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

"অ্যাই কুইক, নিচু হ, কুইক," জোজো ফিসফিস করে নির্দেশ দেয়।

হেডলাইট জ্বালিয়ে দুটো লরি ঘোঁ-ঘোঁ শব্দে মাঠের উপর এগিয়ে আসছে। বেশ কিছু নৌকো পাড়ের কাছে এসে ভিড়েছে। মাঝিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কিসের যেন অপেক্ষায়। লরিগুলো আস্তে আস্তে ঘাটের কাছে এসে থামল। লরির পেছনটা খোলা ; থামতেই মাঝিরা মাল তুলতে লাগল। তারা তুলছে প্যাকিংবাক্স, ঠিক যেমনটা নদীর নীচে থেকে তুলেছিল জোজোরা। নৌকোতে লাট করে প্যাকিংবাক্স রাখা আছে। সব মিলিয়ে অন্তত হাজার-দশেক বাক্স তো হবেই।

সঞ্জিত ফিসফিস করে বলে, "স্মাগলার।"

"তা নয় তো কী, বোকা। শোন, যে-কোনো ভাবে আমাদের ঐ লরিতে উঠতে হবেই। আস্তে আস্তে ঘাপটি মেরে এগোই চল। লরি যেই স্টার্ট নেবে চলন্ত লরিতে লাফিয়ে উঠে পেছনে ঝুলতে ঝুলতে যাব। এগ্রিড ?"

সঞ্জিত ঢোক গিলল। প্রস্তাবটা খুব পুলকিত করছে তাকে এমন নয়, তবে মুখ ফুটে তা বলাও যায় না। তাহলে জোজো তাকে নির্ঘাত ভিতু ভাববে। 'ভিতু' অপবাদের চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

সে মৃদুভাবে বলল, "চল্।"

ঝোপের ছায়া ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলল দুজনে। একটু দূরেই নদীতীরে মাঝিরা নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। শেষের লরিতে মাল তুলে মাঝিরা অন্য মাল আনতে গেছে ওইরকম একটা সময়ে হঠাৎ ফাঁকা পেয়ে পেছন থেকে লাফিয়ে লরিতে উঠে বাক্সের পেছনে লুকিয়ে বসে পড়ল তারা। কিছুক্ষণ বাদেই এক ঝাঁকুনি দিয়ে লরি চলতে শুরু করল।

ড্রাইভার ছাড়া আরো দুজন করে লোক প্রতি লরিতে। তারা সামনে বসেছে। লরি খুব সাবধানে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। এক সময় বাঁক নিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল একটা ঢালু জায়গা দিয়ে। সামনে পুরনো দিনের একটি স্থাপত্য : রামনারায়ণবাবুর বাড়ি যা বর্তমানে কোনো রহস্যময় কারণে ভূতের বাড়ি আখ্যা পাওয়ায় গ্রামবাসী বড় একটা ঘেঁষে না। জোজো সঞ্জিতকে খুঁচিয়ে ইশারা করল। এবার নামার সুযোগ খুঁজতে হবে। লরির পেছনের রড ধরে ঝুলে এবারে লাফ মারতে হবে।

এক লাফে ধপ করে শক্ত মাটিতে পড়ল দুজনে। সঞ্জিতের বাঁ পায়ে বেশ চোট লাগল। সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে জোজোর পেছনে চলল। "একটু আস্তে চল না বাবা—" জোজো অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে বলল, "আস্তে চললে হবে ? লরির সঙ্গে না ছুটলে ওরা যদি হারিয়ে যায় ? চল, ধানখেতের মধ্য দিয়ে ছুটি। তাহলে ওরা আমাদের ট্র্যাক করতে পারবে না।"

পুরনো জমিদারবাড়ির গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকল লরি দুটো। বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটা লোক বেরিয়ে এল ছায়ামূর্তির মতো। গাড়ির থেকে যেসব লোক নামল তাদের মধ্যে একজনকে নেপালি মনে হলেও বাকিরা বাঙালি। একটি লোক তার রোগা পাতলা চেহারা আর নাকের নীচে মস্ত একজোড়া গোঁফ নিয়ে তড়িঘড়ি নির্দেশ দিতে লাগল।

"লালু, তোর হল কী, গতরে জং ধরল নাকি ? লাগা, লাগা, হাত লাগা। অ্যাই বোতল, এদিকে আয়—তুই মাল বের করে ফেল চটপট আর সোনামিঞা অন্য মাল ভরুক ফাঁকা বাক্সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাল পৌঁছে দিতে হবে।"

"হেঁও-ও হেই—মালিকের নামে হেইও হেঁই" সবাই মিলে মাল নামাতে শুরু করে।

একটা গাছের আড়ালে বসে আছে জোজো আর সঞ্জিত। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে হেঁচে উঠল সঞ্জিত। দ্বিতীয় হাঁচিটা চাপতে গিয়ে তার গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল।

রোগা গোঁফওয়ালা লোকটি চোখের নিমেষে শক্তিশালী টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কে ! কে ওখানে ! বেরো।"

জোজো আর সঞ্জিত ততক্ষণে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। বুকের ভেতরটা করে চলেছে ধড়াস-ধড়াস।

হাওয়ায় দোদুল্যমান ধানগাছ ছাড়া টর্চের আলোয় কিছুই ধরা পড়ল না। একটু নাদুস-নুদস টাকমাথা একটি লোক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"দেখে আসব, পার্টনার ?"

"না, তুই তোর কাজ কর। মাল পৌঁছতে দেরি হলে মালিকের হাতে ভোগ হয়ে যাবি।"

জোজো সঞ্জিত বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। লোকগুলো নিজের কাজে মন দিয়েছে। ওরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ছুটতে যাবে, একটা শুকনো শালপাতায় গিয়ে পড়ল জোজোর পা। মচ করে একটা শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বলন্ত তীব্র আলো এসে পড়ল তাদের মুখের উপর।

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

১ কে.জি.
প্যাকেও পাওয়া যায়
যার মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে
একটি মগ

একটা মাঝারি আকারের লম্বাটে ঘর। একটাও জানালা নেই। শুধু অনেক উঁচুতে দুটো ঘুলঘুলি। সঞ্জিত দু-তিনবার চোখ পিটপিট করে চোখ দুটোকে অন্ধকারে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করল। হাত দুটো পেছন দিকে আঁটো করে বাঁধা মোটা নারকেল দড়ি দিয়ে। দড়িটা ক্রমশ কেটে বসছে হাতে-পায়ে। একেই রোগা লোকটা তার ডান হাত ধরে এমন মুচড়ে দিয়েছে যে ব্যথায় অবশ হয়ে গেছে হাতটা। টর্চের পেছনটা দিয়ে জোজোর মাথায় মারার ফলে জোজো ধানখেতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। একটু আগে ওর জ্ঞান ফিরেছে।

সঞ্জিত একটু নড়েচড়ে দেখল দড়ি ছিঁড়ে বেরুবার কোনো উপায় আছে কিনা। কিন্তু নড়লেই সমস্ত শরীরে আরো কেটে বসছে দড়ি। ঘা হয়ে যাচ্ছে।

জোজো মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে ক্ষীণ গলায় বলল, "আমার পকেটে ছুরি আছে। একটা হাত ফ্রি করার চেষ্টা করতে হবে।" সঞ্জিত ভাবল দড়ি কেটেও বা কী লাভ, শয়তানগুলো বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে গেছে। সমস্ত প্যাকিংবাক্সের মাল খালি করে কী যেন অন্য মাল ভরেছে তারা—তারপর তাদের দরজায় শেকল তোলার আগে মুখ বাড়িয়ে বলে গেছে, "এখন চলি, তোদের দিকে মন দেবার সময় নেই। কাল মালিক এসে যা ঝাড়বে—হ্যাহ্ হ্যাহ্ হ্যাহ্—ভেবেও মস্তি লাগে।"

সঞ্জিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, "ওরা প্যাকিং বাক্সে কী ভরছিল রে।"

জোজো বলে, "বুঝিসনি বোকা। গাঁজা, আফিং—এই সব। বিলিতি মাল বোঝাই হয়ে বাক্সগুলো আসে, এখান থেকে ড্রাগ ভরে চালান হয়। জানিস, সারা ইওরোপ আমেরিকায় গাঁজা-ভাঙের চোরাচালান হয় নেপাল, ভারতবর্ষ থেকে।"

"মালিকটা কে রে?"

"পরে বলব।"

"তুই বুঝতে পেরেছিস?"

"না, ভাবছি।" জোজোর গম্ভীর জবাব।

রাত বেড়ে চলে। কানের কাছে ভনভন করে মশা। এই সময় হঠাৎ যেন বাইরের দরজার শেকল খোলার শব্দ হয়। একদৃষ্টে তারা বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ জোজো বড়-বড় চোখ করে বলল, "সঞ্জু, দ্যাখ দরজাটা—"

সঞ্জিত চোখ কুঁচকে তাকাল। দরজার একটা পাল্লা কে যেন খুলছে বাইরে থেকে। এত আস্তে, এত মসৃণভাবে খুলছে যে বলতে গেলে নিঃশব্দেই সম্পন্ন হচ্ছে কাজটা।

"জোজো! সঞ্জু।"

"চুয়া!"

চুয়া এগিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল তুলে বলল, "চুপ! চল, আগে পালাতে হবে।"

* * *

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে জোজো গভীরভাবে নিশ্বাস নিল। চুয়া হাসতে হাসতে বলল, "কী রে। খুব যে আমাকে বাদ দিয়ে আসতে চেয়েছিলি?"

জোজো বেশ রাগতভাবে বলল, "তুই খুব অন্যায় করেছিস। কী করে এলি বল দেখি এবার?"

চুয়া নির্লিপ্ত মুখে একটা ঢিল তুলে দূরে ছুঁড়ে দিল। "কেন, তোরা যেভাবে এলি আমিও তাই। আমি তো তোদের পেছন-পেছনই ছিলাম। শুধু আমার একটু বুদ্ধি বেশি বলে ধরা পড়িনি। তোরা যে ধরা পড়বি জানতাম।"

"বাজে কথা ছাড়।"

তারা নিচু গলায় পরামর্শ করে কী করবে। বাড়ি তো যেতেই হবে সকালের আগে, তা না হলে মাসি চিন্তা করবেন—এদিকে এরা ফিরে এসে যখন দেখবে তারা পালিয়েছে তখন নিশ্চয়ই সরে পড়বে। া বলতে বলতে এগোচ্ছে চুয়া আর জোজো, সিং আগে আগে চলেছে—হঠাৎ কিসে পা ঠেকে সঞ্জিত ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখে ধানখেতের মধ্যে হাত-পা মুখ বাঁধা একটা লোক পড়ে আছে। অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

সঞ্জিত তাদের ডাকল, "শিগ্‌গির আয়, এখানে কালো পড়ে আছে।"

"কী বললি, কালো পড়ে আছে?"

তিনজনে মিলে চটপট খুলে দিল কালোর বাঁধন। খেতের মধ্যে কাটা খাল থেকে জল এনে মুখ আর মাথা ধুইয়ে-মুছিয়ে দিল রুমাল দিয়ে। ধীরে ধীরে কালো উঠে বসল তার চিতাবাঘের মতো শরীর নিয়ে।

* * *

বাড়ির পথে যেতে যেতে কালো তাদের পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। সেদিন নদীতে প্যাকিংবাক্স পাওয়ার পর থেকেই কালোর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে চিনামাঝি ও জমিদারবাড়ির বাবুদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। কিন্তু তবু সে চুপচাপ ছিল, ব্যাপারটা কী দেখার জন্য। বাবুরা মাঝিদের অনেক টাকা দিয়েছে, আর বলেছে যে মুখ খুললে জানে মেরে দেবে। তাছাড়া যতদূর মনে হয় মাঝিরা জানেও না বাবুরা কে, কোথায় থাকেন। যে লরিতে চুয়া উঠেছিল তাতে কালোও ছিল। পরে সে জোজোদের দেখে চমকে যায়। জোজোদের মারতে দেখে সে যখন বাধা দেয়, তখন তার হাত-পা-মুখ বেঁধে লরিতেই আটকে রেখেছিল—যাবার সময় ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে। "ভেবেছিল আমায় জানেই খতম করে দিয়েছে। ব্যাটারা কিন্তু কালোকে এখনো চেনেনি।" ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে কালো বলে।

জোজো একটা নিশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকাল। কত ভাগ্যে বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে তারা বসে আছে। মুখোমুখি বসে আছে চুয়া, দুর্দান্ত, বেপরোয়া, দুষ্টু, মিষ্টি চুয়া, আর তার পাশে তার প্রিয় ভাই সঞ্জিত। সঞ্জিতের নাকের ডগার ছোট্ট আঁচিলটা এই অন্ধকারেও চকচক করছে। জোজো চোখ সরিয়ে নিল। হঠাৎ একটা ছবি বিদ্যুতের মতো ভেসে উঠল তার মাথায়।

"কালো, চুয়া, সঞ্জু।"

"কী?"

"শিগ্‌গির চল—নট আ মোমেন্ট টু বি লস্ট।" জোজোর অস্বাভাবিক উত্তেজনার ছোঁয়াচে তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল। জোজো ততক্ষণে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে।

* * *

মেজমাসির বাড়ি যখন ওরা পৌঁছল তখন ভোর হয়ে এসেছে। বাড়ি তখনো গভীর ঘুমে। নিশিধর লক্ষ্মণরাও ওঠেনি। জোজো কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা প্রবীর

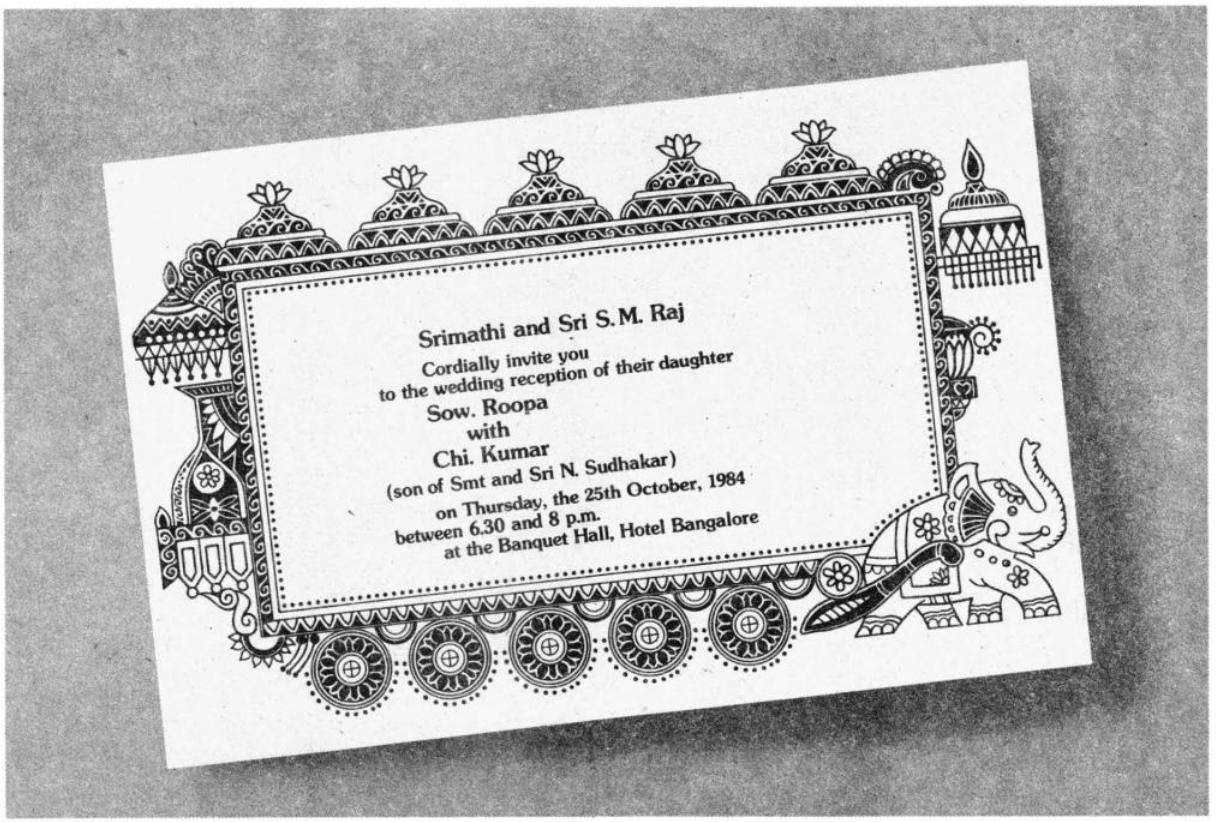

শুধু রূপা নয়... এখন শ্রীমতি রূপা কুমার!

আজ থেকে ওর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে...স্বপ্ন, বাস্তব রূপ নিচ্ছে ! ওর জীবনের এই সেরা মূহুর্ত্তটিতে...আশীর্বাদ করুন, সেরা সময়টি দিয়েই ওকে— একটি এইচ এম টি দিন উপহার... ও আপনাকে করবে স্মরণ, চিরজীবন, প্রতিক্ষণে, প্রতিপলে, বারবার !

এইচ এম টি নিয়ে এসেছে, আপনার বেছে নেওয়ার মত ১২০টি মডেলের সম্ভার ! নির্ভরযোগ্য, শক্তপোক্ত, নিখুঁত আর সময়ও সদা নির্ভুল যার !

যে শুভক্ষণটি আপন ক'রে পাবার স্বপ্ন, সারাজীবনের সবার

ওয়াচ ডিভিশন
hmt 1000
জাতীয় সময়রক্ষী
কারখানা :
বাঙ্গালোর ১ এবং ২
শ্রীনগর, টুমকুর

hmt ঘড়ি
তৈরী হয়েছে আপনারই জন্যে

CLARION/HMT/84198

রণজয়ের ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিল।

রণজয় তখন সবে বুলওয়ার্কার নিয়ে ব্যায়াম শুরু করেছে। দরজায় ধাক্কা শুনে খুলতেই জোজো তার হাত ধরে উত্তেজিতভাবে বলল, "রণজয়দা, শিগ্‌গির পুলিশের কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। আমি আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক স্মাগলারকে ধরতে পেরেছি।" রুদ্ধশ্বাসে জোজো তাকে একটি নাম বলে।

আশ্চর্য এই যে, রণজয় জোজোর কথায় একটুও অবাক হল না। বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি।" তারা পথে বেরুতেই দেখল, স্থানীয় দারোগা কাশীকান্তবাবু আসছেন জিপ নিয়ে। রণজয় তাঁকে থামিয়ে উঠে পড়ে বলল, "চলুন।"

কাশীকান্তবাবু বললেন, "এরা ?"

"সুনন্দাদির ভাইপো-ভাইঝি।"

"বুঝলাম—কিন্তু—"

"পরে বলছি। এখন জোজোর নির্দেশমতো চলুন।"

* * *

পথে বি ডি ও অফিস—সংলগ্ন তাঁর বাসস্থান। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝকঝকে অ্যাম্বুলেন্স। সিটে একজন নেপালি ড্রাইভার। সাদা প্যান্ট আর খাকি রঙের জামা পরে গাড়িতে উঠছেন রবীনবাবু।

রণজয় তাঁকে দেখে গাড়ি থামায়। "এত ভোরে কোথায় চললেন, রবীনবাবু ?"

"এই যাচ্ছি একটু কাকদ্বীপের দিকে—ফারউড পয়েন্টে কী সব গোলমাল হয়েছে—সব অ্যান্টি-সোশ্যালদের ব্যাপার তো।"

"একটু দাঁড়িয়ে যান না। একটা জরুরি কথা ছিল। এক মিনিট।"

রবীনবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন। "এখুনি দাদা অসম্ভব।"

"আরে আরে একটু নামুন—এক মিনিটের তো ব্যাপার।"

"আমি বরং ঘুরেই আসি।" বলে তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট করতে বলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে জোজো করে বসে এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রায় চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে রবীনবাবুর শার্টের কলারটা ঘাড়ের কাছে টেনে বলে, "হ্যাঁ রণজয়দা, যা বলেছি তাই। দারোগাবাবুকে বলুন এখুনি ওকে অ্যারেস্ট করতে।"

জোজোকে এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে রবীনবাবু বলেন, "হাও ডেয়ার ইউ—ইউ লিট্‌ল ডেভিল। বাহাদুর, গাড়ি চালাও।"

কিন্তু কালো ততক্ষণে ড্রাইভারকে টেনে নামাচ্ছে। "এই যে জোজো, ওই বাহাদুরটাই আমাকে ঠেলে ফেলেছিল লরি থেকে।"

তার চেয়েও অবাক কাণ্ড রণজয়ের : সে পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে রবীনবাবুর দিকে তাক করে বলল, "পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব।"

বেচারি কাশীকান্তবাবু অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বাহাদুরের কলার চেপে দাঁড়িয়ে আছে কালো একটা গাছের ঝুরির ওপর পা রেখে। কালোর শরীরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম এই শীতেও, ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি।

* * *

"হ্যাঁ, তিনটে তিল।" কৌতূহলী শ্রোতাদের কাছে গল্প বলা শেষ করে জোজো আবার বলে। "তিন-তিনটে তিল। এখানে রবীনবাবুকে দেখা থেকেই আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিল—কিন্তু কিছুতেই কী সেটা বুঝতে পারছিলাম না। পরে সঞ্জুর আঁচিল আমাকে পথ দেখাল। আসল রবীন চন্দর—ঘাড়ে ছিল তিনটে পাশাপাশি তিল, কিন্তু এই রবীনবাবু সেটা জানতেন না।"

নাকের উপর আঁচিলটা নিয়ে এতদিন সঞ্জিতের দুঃখের শেষ ছিল না। এখন সে বেশ গর্বিতভাবে সেটা প্রদর্শন করল।

"সীতেশবাবুকে সেদিন রাতে দেখে প্রথমটায় একটু অবাকই হয়েছিলাম। কিন্তু একটু ভেবেই বুঝতে পারলাম উনি কমলাদির কাছে গিয়েছিলেন—নিশিধরদাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওদের শিগ্‌গিরই বিয়ে হচ্ছে।"

কমলাদি খুব লজ্জিত ও বেশ খুশি-খুশি মুখে বললেন, "বোঝো ! সাংঘাতিক লোক তো নিশিধর।"

মেজমাসি বললেন, "বেশ, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আসল রবীনবাবু তাহলে কোথায় ?"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ঘরে ঢুকল প্রবীর।সঙ্গে—হ্যাঁ, জোজো এক পলক দেখেই চিনতে পারল—রবীন চন্দ।

সকলে হৈ-চৈ করে উঠল। রবীনবাবু বললেন, ডায়মণ্ডহারবার থেকে যে জিপে আসছিলেন সেটা নাকি পথে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়ে আটকে দেয়। তারপর রবীনবাবু ও তাঁর ড্রাইভারকে বন্দুক দেখিয়ে নিয়ে তোলে অ্যাম্বুলেন্সে। একটা বিশাল পোড়ো বাড়িতে তাঁরা এতদিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিলেন—তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র, মায় গায়ের জামা-কাপড়ও তারা খুলে নিয়ে গিয়েছিল। আজ পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেছে।

সুনন্দা দেবী রণজয় আর প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা তাহলে ..."

"হ্যাঁ, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমি আপনাদের বন্ধুপুত্র বটে তবে পুলিশে চাকরি করি—স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। আর প্রবীরও তাই। এখানে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম স্মাগলারদের ধরার জন্য।"

সুনন্দা দেবী মুখ টিপে হেসে বললেন, "তা তোমরা এতদিন থেকে যা করতে পারলে না, আমার ভাইপো-ভাইঝিরা তা কেমন করে দুদিনে করে ফেলল দেখলে ?"

প্রবীর চুয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর খুকি বলব না। দামিনী। পৃথিবীর সব চাইতে সাহসী মেয়ে।"

"পৃথিবীর সব চাইতে সাহসী ছেলেমেয়ের দল।" বললেন রণজয়দা।

সাহসী ছেলেমেয়েরা চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে বসে আছে এখন। তাদের শরীরে একটা উত্তেজনার তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎটা একটা ধোঁয়াটে রেখা হয়ে যেন ভেসে উঠছে চোখের সামনে। তাদের কেন জানি মনে হচ্ছে বহু রোমাঞ্চকর, নাটকীয় ঘটনার তারায় খচিত হবে তাদের জীবন। তারা কখনো ভয় পাবে না, কখনো পিছুপা হবে না, গুটিয়ে থাকবে না সঙ্কোচে। একবারই যখন বাঁচবে, বাঁচবে বাঁচার মতো করে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

তারপর সাজসজ্জা করে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে উত্তর-মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় ...

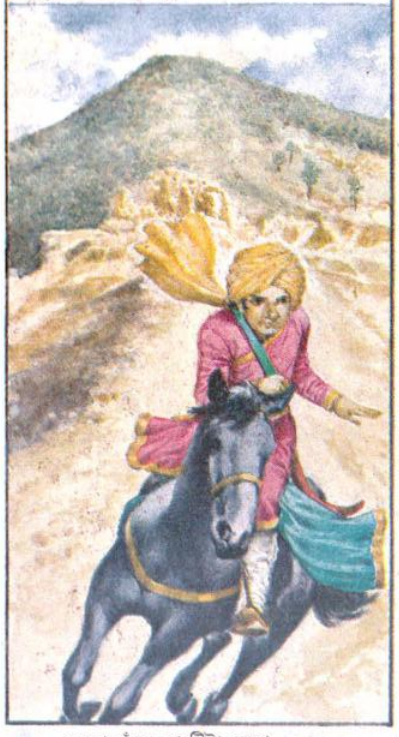

চাকন দুর্গ থেকে পুনা ন'দশ ক্রোশ পথ। সন্ধের আগেই পৌঁছতে হবে।

সুতো বেঁধে আংটিটা রেখে দিয়েছি আঙরাখার তলায়—বুকের কাছে। কুঙ্কু পেলে যা খুশি হবে না!

কিন্তু কুঙ্কুর বাবা বিঠঠল পাটিল আমাকে দেখে খুশি হবে কি?

সদাশিব চলেছে ... চাকন দুর্গ এর আগে সে কখনও দেখেনি। মহারাষ্ট্রে অসংখ্য দুর্গ আছে, তার মধ্যে কোনোটা মুসলমানদের অধীন, কোনোটা স্বাধীন। চাকন একদিন শাহজির জাগিরের মধ্যে ছিল, এখন স্বাধীন।

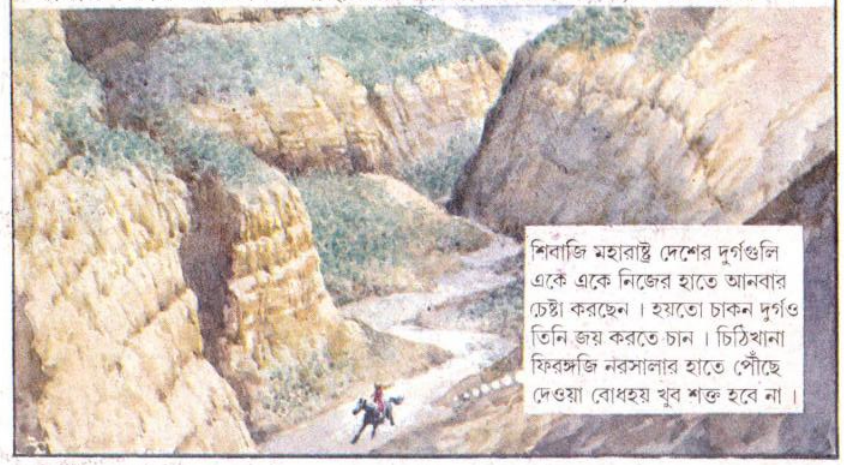

ক্রমে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল, অসমতল কান্তারের শেষে চাকন দুর্গ দেখা দিল ... দুর্গের বাইরে, খানিকটা দূরে একটা গ্রাম। পড়ন্ত রোদ্দুরে গাঁয়ের খড়-ছাওয়া কুঁড়েঘরগুলি দেখা যাচ্ছে।

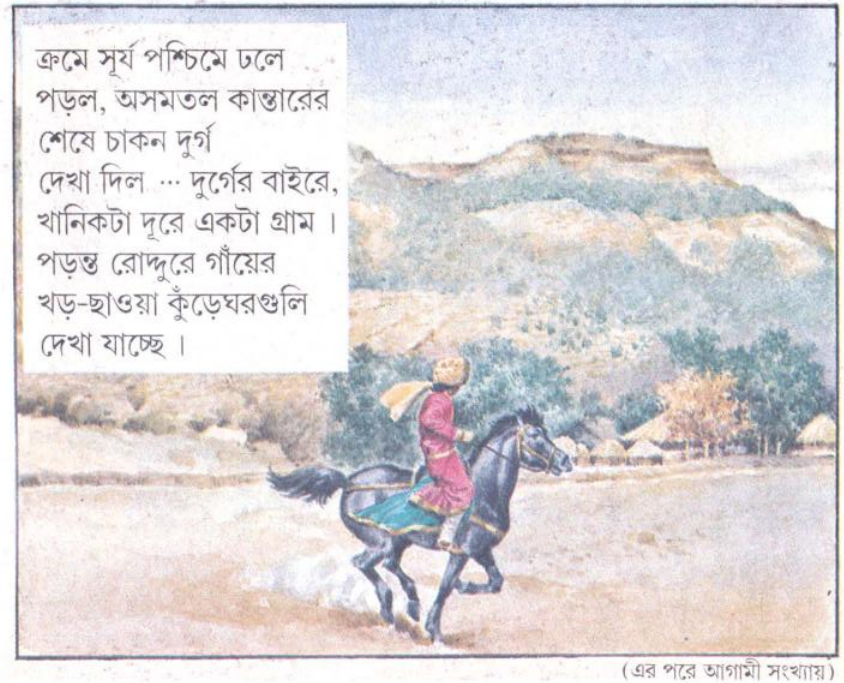

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

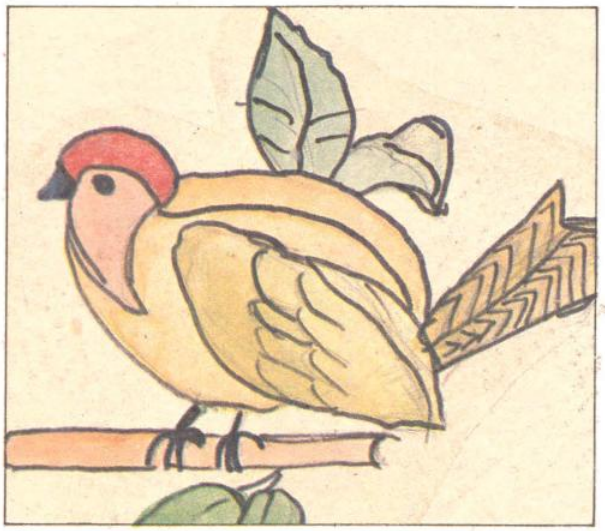

ছবি এঁকেছে **কুচি সরকার** (বয়স ১০)

কেমন করে

গোল চাঁদ বাঁকা-বাঁকা চোখে
রামধনুর সাত রঙ ভাসে,
ঝিকিমিকি তারা ওই আকাশে
আলোর বন্যায় খুশি হয়ে হাসে।
ধোঁয়াগুলো মেঘ হয়ে ওড়ে
আকাশ তো অনেক দূরে,
ডানা মেলে পাখি ওড়ে
বলো মা কেমন করে ?

জ্যোতির্ময়লাল মাইতি (বয়স ৬)

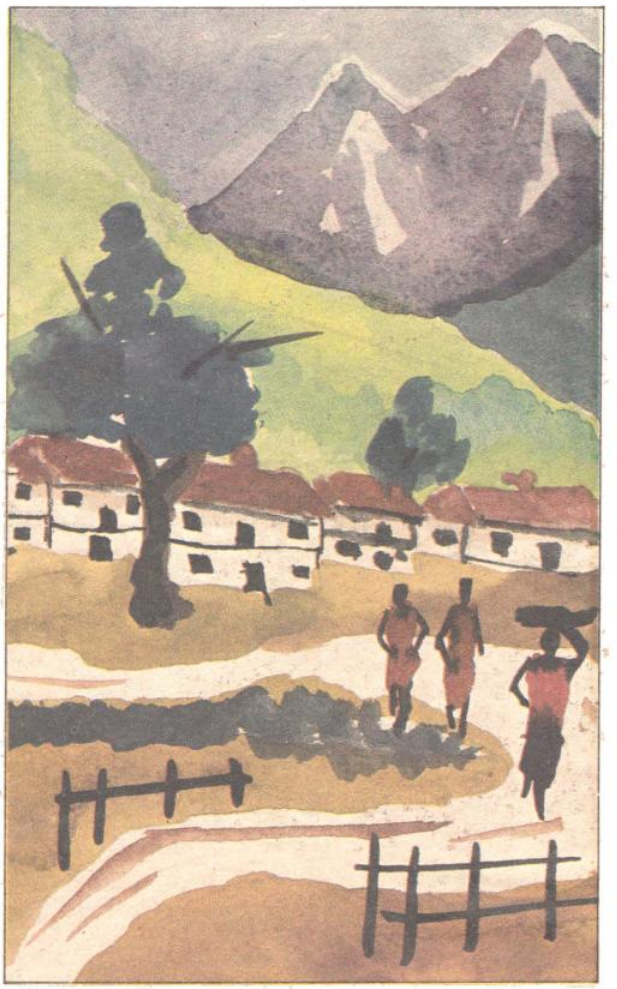

ছবি এঁকেছে **কিংশুক ঘোষ** (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে **ঝিলাম ঘোষদস্তিদার** (বয়স ৮)

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু…

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া, যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে? রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত …বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন…

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

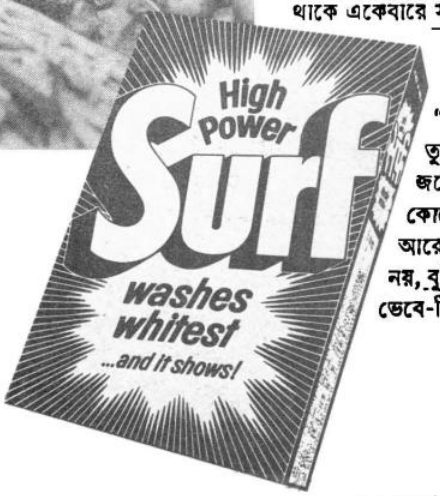

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTAS SU 320 2619 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

১৮৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শার্লক হোম্‌স যে-সমস্ত বিচিত্র ধরনের রোমাঞ্চকর রহস্যের তদন্ত করেছে সে-সব ঘটনার কথাই আমার সেই সময়ের ডায়েরির পাতায় সংক্ষেপে লেখা আছে। খুব মুশকিলে পড়ি যখন সে ব্যাপারগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠকদের মতো করে লিখতে যাই। সমস্যা হয় কোন্ ঘটনাটাকে বাদ দিয়ে কোন্ ঘটনাটা লিখি। যে-সব ঘটনা কোনো-না-কোনো কারণে সাধারণ লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তখনই একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে বের হয়েছিল। সে-সব কথা এখনও অনেকেরই মনে আছে। তাই ঐ ঘটনাগুলো আবার নতুন করে লেখবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে সাধারণ লোকের জানা নেই এমন ঘটনার সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এইসব ঘটনার মধ্যে কয়েকটা আবার এতই জোলো আর সাদামাটা যে সে-সব অতি তুচ্ছ সমস্যার সমাধান সরকারি পুলিশই করতে পারত। এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারগুলো লিখতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এর মধ্যে অবশ্য দু-একটা 'কেস্' আবার এমনই সাংঘাতিক রকমের জটিল যে, সেই নিশ্ছিদ্র রহস্যের জাল ভেদ করতে স্বয়ং শার্লক হোম্‌সই ব্যর্থ হয়েছে। আরও কয়েকটা রহস্যের সমাধান হোম্‌স করতে পারেনি কেননা তার হাতে কোনোরকম সূত্রই ছিল না। এ-ছাড়া কতকগুলো রহস্যের কিনারা আজও হয়নি। তদন্ত চলছে। এই ঘটনাগুলোর কথাও লিখে লাভ হবে না বলে আমার মনে হয়। সাধারণ পাঠক এগুলো পড়ে কোনো আনন্দই পাবেন না। কেননা এ ঘটনাগুলোর শুরু মানে রহস্যের 'সূত্রপাত' আছে কিন্তু শেষ অর্থাৎ রহস্যের কোনো 'সমাধান' নেই। এ-ছাড়াও আর এক রকমের তদন্তের কথা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। সে ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্যের আংশিক সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল হোম্‌সের পক্ষে। আজকে আমি এই রকমই একটা ঘটনার কথা লিখব বলে মনে করেছি। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায়নি। আর ভবিষ্যতেও যে এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যাবে তা মনে হয় না। তবুও যে এই ঘটনাটার কথা লিখছি তার কারণ হল এই যে এর শুরুটা যেমন অত্যন্ত অদ্ভুত শেষটাও তেমনি আশ্চর্যরকম অভিনব।

১৮৮৭ সালের ডায়েরির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অনেকগুলো রহস্যজনক ঘটনার কথা লেখা দেখছি। যেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'প্যারাডল চেম্বার'-এর রহস্য, ব্রিটিশ জাহাজ সোফি অ্যাণ্ডারসনের অদ্ভুতভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, উফা দ্বীপে গ্রাইস প্যাটারসনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আর সবশেষে ক্যাম্বারওয়েলে বিষপ্রয়োগে হত্যার ঘটনাটা। এই ক্যাম্বারওয়েল খুনের ব্যাপারটা তদন্ত করতে গিয়ে হোম্‌স মৃত ব্যক্তির হাতঘড়ি পরীক্ষা করে দেখায় যে, ঐ খুনের ঘটনা ঘটবার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে ঘড়িটায় দম দেওয়া হয়েছিল। তার থেকে প্রমাণ হয় যে, ঐ ব্যক্তি খুন হবার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে শুতে যান। হোম্‌সের এই আবিষ্কারের ফলে তদন্তের ধারাটা একটা নতুন মোড় নেয় আর তার ফলে যে নির্দোষ সে মুক্তি পায়, ও দোষীর সাজা হয়। এ-সব তদন্তের সব কথা ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ মতো আমার লেখবার ইচ্ছে আছে। তবে যে তদন্তের কথা আজ এখানে লিখছি তার সঙ্গে ঐ সব রহস্যের তুলনাই হয় না। এ ঘটনাটা আরও অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি রোমহর্ষক। বিজ্ঞাপনের ভাষায় রীতিমত গায়ে কাঁটা-দিয়ে-ওঠা কাণ্ড।

সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চলল, এ-বছরে এখনও পর্যন্ত জল-ঝড়ের আর শেষ নেই। আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে যেমনি প্রচণ্ড ঝড় আর তেমনি তুমুল বৃষ্টি। ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে বৃষ্টি। জানলার শার্সিতে বৃষ্টির ছাটের চড়চড় শব্দের বিরাম নেই। ঘরের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে আমরা দুজনে বসে ছিলুম। তবুও মাঝেমাঝে যখন হুঙ্কার দিয়ে ঝড় আছড়ে পড়ে দরজার কপাট আর জানলার ছিটকিনি নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তখন খাস লণ্ডন শহরের বুকে বসেও আমার মনে হচ্ছিল যে, এ যেন সাধারণ ঝড় নয়, কোনো একটা অশুভশক্তি আমাদের ধ্বংস করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় জলের তাণ্ডব-নৃত্যও ক্রমশ বাড়তে লাগল। ঘরের ফায়ারপ্লেসে গনগন করে আগুন জ্বলছিল। ফায়ারপ্লেসের একধারে চুপচাপ আর হয়তো খানিকটা বা বিমর্ষভাবে বসে শার্লক হোম্‌স তার নিজের তদন্তের একটা নির্দেশিকা তৈরি করছিল। ফায়ারপ্লেসের আর একধারে একটা চেয়ারে বসে আমি ক্লার্ক রাসেলের সমুদ্র নিয়ে লেখা গল্পের বই পড়ছিলুম। বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে রাসেলের কাহিনীর পরিবেশ চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে। উত্তাল সমুদ্রের বর্ণনা পড়তে-পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন আর বেকার স্ট্রিটে নেই, ভেসে চলেছি এক তুফানের মুখে-পড়া জাহাজে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে, আমার স্ত্রী তাঁর এক দূর সম্পর্কের অসুস্থ আত্মীয়াকে দেখতে লণ্ডনের বাইরে গেছেন বলে আমি আবার আমার পুরনো আস্তানায় ফিরে এসেছি।

"কে যেন দরজার কড়া নাড়ল বলে মনে হল না ?" আমি হোম্‌সের দিকে তাকালুম।

"এই দুর্যোগ মাথায় করে এত রাত্তিরে কে আবার এল বলো তো ? তোমার কোনো বন্ধুর আসবার কথা আছে নাকি ?"

"তুমি তো খুব ভাল করেই জানো ওয়াটসন যে তুমি ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনো বন্ধু নেই। আর তাছাড়া আমি অকারণে আমার কাছে কেউ আসুক তা চাই না।"

"তা হলে এ নিশ্চয়ই তোমার কোনো মক্কেল হবে।"

"তা যদি হয় তো বুঝতে হবে যে, তার সমস্যা খুবই গুরুতর। তা না হলে অন্তত আজকের মতো এইরকম দুর্যোগের রাত্তিরে কেউ চট করে ঘরের বাইরে বেরুতে রাজি হবে না। তবে আমার মনে হচ্ছে সেরকম কেউ নয়। এ আমাদের বাড়িওলা গিন্নির কোনো বান্ধবী-টান্ধবি হবেন।"

শার্লক হোম্‌সের ধারণা যে ঠিক নয় তা বোঝা গেল একটু পরেই। আমাদের ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল আর তখনই দরজায় টোকা পড়ল। শার্লক হোম্‌স তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টেবিল-ল্যাম্পটা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যাতে সে নিজে থাকে আলোর পেছনে আর সমস্ত আলোটা পড়ে আগন্তুকের মুখের ওপরে।

হোম্‌স বললে, "ভেতরে আসুন।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটি যুবক। তার বয়স খুব বেশি হলে বাইশ-তেইশ বছর হবে। তার জামাকাপড় বেশ শৌখিন আর পরিপাটি। আর প্রথম দর্শনেই যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হল তার ভদ্র সভ্য আচরণ। যুবকটির হাতের ছাতা থেকে যেরকম ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছিল আর তার গায়ের বর্ষাতি জলে ভিজে যেরকম চকচক করছিল তার থেকে আমাদের বুঝতে কষ্ট হল না যে বাইরে কী তুমুল ঝড় জল হচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই টেবিলল্যাম্পের জোরালো আলোয় যুবকটির চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সে খানিকটা হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তার চোখে-মুখে এমন একটা হতাশা আর চাপা দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছিল যে আমি বুঝতে পারলুম সে খুবই অশান্তিতে রয়েছে।

"আগে থেকে না বলেকয়ে হঠাৎ এইভাবে এসে পড়ে আপনাদের অসুবিধে করার জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আরও ক্ষমা চাইছি আপনাদের এই সুন্দর করে সাজানো ঘরটি জলে-কাদায় নোংরা করে ফেলার জন্যে," যুবকটি রুমাল দিয়ে তার চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বলল।

তার কথার উত্তরে হোম্‌স বললে, "আপনার ছাতা আর বর্ষাতিটা আমার হাতে দিন। আমি ওই কোণে রেখে দিচ্ছি। কোনো অসুবিধে হবে না, একটু পরেই শুকিয়ে যাবে।... আপনি দেখছি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দে।"

"হ্যাঁ, আমি হশ্যাম থেকে আসছি।"

"আপনার জুতোয় যে ধরনের খড়িমাটি লেগে রয়েছে তা ওই দিকের মাটির বিশেষ গুণ," হোম্‌স মৃদু হেসে বললে।

"আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।"

"পরামর্শ দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

"শুধু পরামর্শ নয়, আপনার সাহায্যও বিশেষ দরকার।"

"আমার পরামর্শ পাওয়াটা যত সহজ, সাহায্য পাওয়াটা কিন্তু তত সোজা নয়।"

"আপনার কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। মেজর পেণ্ডারগাস্ট আমাকে নিজে বলেছেন যে, কী রকম অদ্ভুতভাবে আপনি তাকে ট্যাংকারভিল ক্লাবের নোংরা ব্যাপারটা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।"

"সে কথা ঠিক। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে তাস-খেলায় জোচ্চুরির যে বদনাম দেওয়া হয়েছিল সেটা ডাহা মিথ্যে।"

"মেজর পেণ্ডারগাস্ট যে আমাকে বললেন যে-কোনো রকম রহস্যের কিনারা আপনি করে দিতে পারেন।"

"এটা তিনি একটু বাড়িয়ে বলেছেন," হোম্‌স বললে। "তিনি আমাকে একথাও বললেন যে, আজ পর্যন্ত কোনো রহস্যের সমাধান করতে আপনি ব্যর্থ হননি।"

"না, এ-কথাটা তিনি ঠিক বলেননি। এ-পর্যন্ত আমাকে চার-চারবার হার মানতে হয়েছে। তিনবার হেরেছি তিন ভদ্রলোকের কাছে, আর একবার এক ভদ্রমহিলার কাছে।"

"কিন্তু আপনার সাফল্যের বিরাট সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে এই চারটে পরাজয় তো কিছুই নয়।"

"হ্যাঁ, একথা অবশ্য ঠিক যে মোটামুটিভাবে আমি প্রায় সব ব্যাপারেই সফল হয়েছি।"

"তা হলে আমার এই ব্যাপারেও নিশ্চয়ই আপনি সফল হবেন।"

হোম্‌স বলল, "তা হলে আগে আপনি ওই চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের কাছে টেনে নিয়ে এসে বসে শরীরটা একটু গরম করে নিন। তারপর আমাকে খুলে বলুন আপনার সমস্যাটা কী।"

"এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়।"

হোম্‌স শান্তভাবে বললে, "সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমার পরামর্শ চাইতে কেউ আসে না। এটা অবশ্য আমার অহংকার বলে ভাববেন না।"

"না, আমি আপনার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তবুও গত কয়েকমাস ধরে আমাদের সংসারে যে রকম রহস্যময় ঘটনা সব ঘটেছে সে রকম ঘটনার দ্বিতীয় কোনো নজির আর আছে কিনা আমার সন্দেহ।"

"আপনার কথা শুনে আমার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে," হোম্‌স বলল। "আপনি আগাগোড়া সব কথা আমাকে খুলে বলুন। কোনো কিছু গোপন করবেন না। তারপরে আমার যা জানবার তা আমি জেনে নেব।"

চেয়ারটাকে যতখানি সম্ভব ফায়ারপ্লেসের কাছে সরিয়ে এনে তার ভিজে জুতোপরা পাদুটো ফায়ারপ্লেসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যুবকটি তার কথা বলতে শুরু করল।

"আমার নাম জন ওপনশ। কিন্তু যে সমস্যার সমাধানের জন্যে এই প্রবল ঝড়-জল-দুর্যোগের মধ্যে অসময়ে আপনাকে বিব্রত করছি সেটা কিন্তু আমার নিজের কোনো ব্যাপার নয়। তাই যদি একটু পুরনো দিনের কথা দিয়ে আরম্ভ করি তাহলে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধে হবে।

"আমার ঠাকুর্দার দুই ছেলে—আমার বাবা জোসেফ আর কাকা ইলিয়াস। কভেন্ট্রিতে আমার বাবার একটা ছোটখাটো কারখানা ছিল। তখন বাইসাইকেলের ফ্যাশান খুব হয়েছিল। বাবার কারখানায় সাইকেলের যন্ত্রপাতি তৈরি হত বলে কারখানাটারও খুব উন্নতি হতে লাগল। এই সময়ে বাবা একটা ছ্যাঁদা বা ফুটো হবে না এমন ধরনের টায়ার আবিষ্কার করে তার পেটেন্ট মানে বিক্রিস্বত্ব নিয়ে নেন। আর তার ফলে তাঁর কারখানার লাভ হু-হু করে বাড়তে থাকে। বেশ কিছু টাকা জমবার পর আমার বাবা মোটা টাকায় তাঁর চালু কারখানাটা বিক্রি করে দিলেন। তারপর বেশ আরাম করে অবসরজীবন কাটাতে লাগলেন।

"আমার কাকা ইলিয়াস অল্প বয়েসে রোজগারের ধান্ধায়

আমেরিকা চলে যান। সেখানে ফ্লোরিডায় আস্তানা গেড়ে তিনি চাষবাসের কাজ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাকা বেশ ভাল টাকাপয়সা রোজগার করেন। তারপর যখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বাধল তখন কাকা প্রথমে জ্যাকসনের পক্ষে আর পরে হুডের দলে যোগ দিলেন। যুদ্ধে কাকা বেশ নাম করেছিলেন। সাধারণ সৈন্য থেকে তিনি 'কর্নেল' পর্যন্ত হয়েছিলেন। তারপর লি যখন যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি করলেন তখন কাকা আবার তাঁর পুরনো পেশা মানে চাষবাসের কাজে ফিরে গেলেন। এর প্রায় বছর-চারেক পরে ১৮৬৯ কি '৭০ সালে তিনি আবার হঠাৎ একদিন এদেশে ফিরে এলেন। আর সাসেক্সের হর্শ্যামের কাছে একটা বাড়ি কিনে বাস করতে লাগলেন। আমরা শুনেছি যে কাকা আমেরিকাতে শুধু প্রচুর টাকা রোজগারই করেননি, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও হয়েছিল খুব। তা সত্ত্বেও তিনি যে আমেরিকা ছেড়ে চলে এলেন তার একমাত্র কারণ হল নিগ্রোদের ওপর তাঁর অসম্ভব ঘৃণা। সেইজন্যে রিপাব্লিকান দল যখন নিগ্রোদের ভোট দেবার সুযোগ করে দিল তখন তিনি বিরক্ত হয়ে আমেরিকা ছেড়ে এদেশে চলে এলেন। আমার কাকা একজন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। যেমন রাগী আর তেমনি বদমেজাজী। রেগে গেলে তাঁর ভালমন্দ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা তো দূরের কথা মানুষজনের সঙ্গ এড়িয়ে একলা-একলা থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। হর্শ্যামে থাকবার সময় তিনি কোনোদিন কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে আমার অন্তত মনে পড়ে না। কাকা একটা বিরাট বাড়িতে থাকতেন। তিনি বাড়ির বাগান আর মাঠের মধ্যেই নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতেন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্যে। তবে আবার কখনও কখনও এমনও হত যে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি নিজের ঘরের মধ্যে চুপচাপ একা-একা বসে থাকতেন। তখন তিনি অনবরত কাপের পর কাপ কড়া চা খেতেন আর ধূমপান করতেন। যখন এইরকম অবস্থা চলত তখন বাইরের কোনো অপরিচিত লোক তো দূরের কথা তাঁর নিজের ভাই, মানে আমার বাবার সঙ্গেও দেখা করতেন না।

"তবে আমার কথা অবশ্য আলাদা। কাকা আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। তার কারণ বোধহয় এই যে তিনি আমাকে প্রথম যখন দেখেন তখন আমি একদম ছেলেমানুষ। তখন আমার বয়েস খুব বেশি হলে হবে এগারো কি বারো। সেটা '৭৮ সালের কথা। তারও প্রায় আট-ন'বছর আগে থেকে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে ভীষণ ধরে বসলেন আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দেবার জন্যে। আমাকে তিনি বরাবরই খুব স্নেহ করতেন। যখন তাঁর মাথা ঠাণ্ডা থাকত তখন তিনি আমার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতো লুডো ক্যারম এইসব খেলতেন। তবে সেই সময় থেকেই তিনি সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব—চাকরবাকরদের তদারকি থেকে শুরু করে দোকানির হিসেব দেখা, পাওনা মেটানো সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলতে গেলে আমাকেই তিনি সংসারের কর্তা করে দিয়েছিলেন। অথচ তখন আমার বয়েস ষোলো বছরও হয়নি। আমার কাছেই বাড়ির সব চাবি থাকত। আমি যেখানে খুশি যেতে পারতুম। তবে তাঁর নিজের ব্যাপারে তিনি কখনও আমাকে কোনো কথা বলেননি

আর আমিও সে ধরনের কোনো কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করতুম না। তবে বাড়ির ছাদের ওপর যে চিলেকোঠা ঘরটা আছে সেটা সব সময়েই বন্ধ থাকত। আর সেই ঘরে তিনি কাউকে এমন-কী আমাকে পর্যন্ত কখনও ঢুকতে দিতেন না। বুঝতেই পারছেন, বয়েসটা কম ছিল বলেই হোক আর নিষেধটা খুব কড়া ছিল বলেই হোক কৌতূহলটা ছিল বেশি মাত্রায়। সেই জন্যে আমি ফাঁক পেলেই দরজার চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখতে চেষ্টা করতুম ওই ঘরের মধ্যে কীসব রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু খুবই মনখারাপ হয়ে যেত যখন দেখতুম যে, আর পাঁচটা বাড়ির চিলেকোঠায় যা-যা থাকে, যেমন পুরনো ভাঙা বাক্স-প্যাঁটরা আর পুঁটুলি ইত্যাদি, আমাদের ওই ঘরটাতেও এই সব আজেবাজে জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই।

"এ-বছরের মার্চ মাসে হঠাৎ একদিন আমার কাকার নামে একটা চিঠি এল। চিঠিটায় বিদেশী ডাকটিকিট লাগানো ছিল। এমনিতে কাকার নামে বড় একটা চিঠিপত্র আসে না। দোকানদারদের পাওনা সব সময়ে আমরা নগদ টাকায় মিটিয়ে দিই। আর কাকার এমন কোনো বন্ধুবান্ধব আছে বলে শুনিনি যে কিনা কাকাকে চিঠি লিখতে পারে। চিঠিটা হাতে নিয়ে কাকা বললেন, 'চিঠিটা দেখছি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। টিকিটের ওপর পণ্ডিচেরি ডাকঘরের ছাপ রয়েছে। এ আবার কী ব্যাপার।'

"কাকা খামটা ছিঁড়তেই খামের ভেতর থেকে টেবিলের ওপর পড়ল পাঁচটা কমলালেবুর শুকনো বীজ।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

একটা ব্রণ, তারপর আরও একটা, এমনি ভাবে ব্রণ বাড়তেই থাকে।
তাইতো আপনার দরকার বিশেষ ক্রিয়াযুক্ত উন্নত মানের ক্লিয়ারাসিল।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল

অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসানযুক্ত

যা, ব্রণ সাফ ক'রে দেয়
আর তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে।

ব্রণ হ'ল বয়স বাড়ারই একটি অঙ্গবিশেষ। কৈশোরত্বে পা দেওয়ার পর কতবার ব্রণ বেরোতে থাকে, আবার মিলিয়ে যেতে থাকে—কিন্তু, ঐ ব্রণকে তখন অবহেলা করলে বা তার জন্যে শুধু বসে বসে চিন্তা করলেই তো আর কোনো সুরাহা হয়না, বা ওগুলি নখ দিয়ে টিপে দিয়েও দূর করা যায় না—তাতে শুধু জীবাণু আরও ছড়িয়ে পড়ে আর আরও ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণর সমস্যায় এই ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী কেন :

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল যে শুধু ব্রণ সাফই ক'রে দেয় তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে—কারণ, এতে যে থাকে একটি বিশেষ অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধযুক্ত ট্রাইক্লোসান। ট্রাইক্লোসানযুক্ত এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, জীবাণু থেকে হওয়া ব্রণকে বাড়তে দেয় না —আর, ত্বকের বাকী অংশগুলিও দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, আর তাই, ব্রণও আর বাড়তে পারে না।

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল থেকে কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

প্রথমে মুখটি ধুয়ে নিন। তারপর এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল সাবা মুখে লাগান—আর, ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগান। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল একনাগাড়ে কিছুকাল ধরে, সকাল ও রাত্রি, দিনে কমপক্ষে এই দুবার ক'রে লাগিয়ে যান।

ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন ক্লিয়ারাসিল তিন ভাবে কাজ করে

ব্রণকে খুলে দেয়
এর বিশেষ ওষুধ, ব্রণর মুখের ছাল ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে
নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল-এ আছে, এক অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান। যে ব্যাকটিরিয়া থেকে ব্রণ হয় বা তা ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেল শুষে নিয়ে, ব্রণ শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল মুখের লোম কূপও নরম করে আলগা করে দিতে পারে।

এর সঙ্গে এও পাবেন ঃ
ক্লিয়ারাসিল ড্যানিশিং মেডিকেশন

OBM/3556 BEN

'ইণ্ডিয়াটা কোথায় ?'

সোমা দত্ত

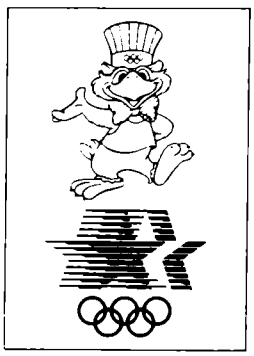

ভিলেজের বাসিন্দা হবার দিন থেকেই একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম, ভিনদেশী অ্যাথলিটদের মধ্যে পিন সংগ্রহের আগ্রহটা খুব বেশি। আমার তো এই বাতিক প্রচণ্ড। অনেকে তো তাদের দেশের পিন গোছা গোছা পকেটে নিয়ে ঘুরত। রাস্তায়, প্র্যাকটিসে অথবা ডাইনিং হলে দেখা হলে একে অপরের কোট, টুপি অথবা ট্র্যাকসুটে লাগিয়ে পিন বিনিময় করত। আমাদের কাছেও অনেকে এসে চাইত। আর আমরা ভারতীয়রা সিঁটিয়ে থাকতাম। পিনগুলি দেয় প্রত্যেক দেশের ওলিম্পিক সংস্থা। আমাদের তখনও কেউ দেয়নি। অন্যদের থেকে হাত পেতে নেব, অথচ আমরা দিতে পারব না—তা তো হয় না। তাই উত্তরে আমরা বলতাম, "আমাদের টিম-ম্যানেজার এখনও আসেননি। পরের ফ্লাইটেই উনি পিন নিয়ে আসবেন। সেজন্য ওগুলো এখনও আমরা হাতে পাইনি।" এইভাবে রোজ শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হত।

আমাদের সত্যিকারের অবস্থা অন্যরা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিল। সেজন্য পরের দিকে ওরা আর পিন চেয়ে আমাদের বিব্রত করত না। পিন বদলাবদলি করাটা আর কিছুই নয়—ওলিম্পিকের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা শুধু। আজ থেকে অনেক বছর বাদেও পিন দেখলে মনে পড়বে অনেক কথা। ভিলেজে অন্যদের মধ্যে পিন দেওয়া-নেওয়ার পালা যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন একদিন শুটিং দলের গান মেকানিক বালসম্মুগম আমাদের প্রত্যেকের হাতে মাত্র দশটা করে পিন গুঁজে দিলেন। এশিয়াডের সময় তৈরি আপ্পু-মার্কা পিন। অন্যদের দেবার মতো নয়।

দিল্লি এশিয়াডের সময়ই আমার এ-ব্যাপারে ভাল শিক্ষা হয়েছিল। সেজন্য টেকসাস থেকেই বাবাকে ফোনে বলে দিয়েছিলাম লস অ্যাঞ্জেলেসে কিছু পিন আর অন্য স্যুভেনির ভাল দাম দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা ওখানে পৌঁছবার পরে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল ঠিক, তবুও গোটা-তিরিশ পিন যোগাড় করতে পেরেছি। এর মধ্যে খুব জমকালো পিন আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া আর ইতালির। গেমস ভিলেজে যে-আমেরিকান মেয়েটা আমাকে পিন দিয়েছিল, তার নাম জানতাম না। দেশে ফেরার পথে নিউইয়র্কে জেঠুর বাড়িতে বসে একদিন টি ভি দেখতে দেখতে তার নাম জেনে লাফিয়ে উঠেছিলাম। সেই মেয়েটা আর কেউ নয়, জিমনাস্ট মারি লু রেটন। যার কৃতিত্বে মেয়েদের টিম ইভেণ্টে আমেরিকা এই প্রথম ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

পিন ছাড়া আর যে জিনিসটা এবার আমাদের কাছে বিদেশীরা চাইত তা হল, আমাদের দেশের মুদ্রা। বিদেশী মুদ্রা জমানো যাদের নেশা, তাদের পক্ষে ওলিম্পিক গেমস আদর্শ জায়গা। সব থেকে চাহিদা বেশি অবশ্য আমেরিকার সেণ্ট, ডলার, ফ্রান্সের ফ্রাঁ আর ইতালির লিরার। পিন নেই তো কী হয়েছে, কয়েন আছে—তাই সই। এ-ছাড়া ছোটখাটো উপহার দেওয়া-নেওয়া তো লেগেই থাকত। শুটিং রেঞ্জে যাবার পথে বাসে একদিন জাপানি দলের কোচ আমাকে পকেট-ক্যালকুলেটর উপহার দিয়েছিলেন। ওদের ছেলেমেয়েরা দিত কাঁচের তৈরি খেলনা, চমৎকার দেখতে। আর আমেরিকানরা দিত চাবির রিং, স্ট্যাচু অব লিবার্টির ছোট্ট প্রতিমূর্তি এবং অন্যান্য স্মারক। ভিলেজের ভেতরেই নানা ধরনের স্মারক বিক্রি হত। সেই দোকানগুলিতে দুর্গাপূজার ভিড় যেন লেগেই থাকত।

রোজ আমরা হাতখরচ পেতাম সাত ডলার করে। অর্থাৎ আমাদের সাতাত্তর টাকার মতো। ওই টাকা থেকে টুকিটাকি জিনিস কিনে রাখতাম। ভিলেজের বাইরে অনেক দোকানে ঝোলানো এক ধরনের টি-শার্ট বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। শার্টের বুকে পাঁচ-রঙা ওলিম্পিক বলয়। মাঝের লাল বলয়টা ভাঙা। আর তা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। এই প্রতীকটা আর কিছুই নয়। ওলিম্পিকে না আসার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তীব্র শ্লেষ। অনেক টি-শার্টে আবার খোলাখুলি লেখা ছিল—"রাশিয়ান বয়কট, ওয়েল ডান।" আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রি-ওলিম্পিকের সময় এসব কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি। যে সব রুশ শুটার গিয়েছিল—তাদের আমেরিকানরা জামাই-আদরে রেখেছিল।

স্বপ্নের ঘোরে যেন দিনগুলি হু-হু করে কেটে যাচ্ছিল। প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে আসছে। সারাদিন রেঞ্জেই পড়ে থাকতাম। ওলিম্পিক গেমসকে বলা হয়—মহামিলনের মেলা। আমার কিন্তু মনে হয়, এখন আর ওই কথাটা খাটে না। ওখানে মেলামেশার সুযোগটা খুবই কম। খেলোয়াড়রা নিছক অংশ নেবার জন্যই গেমসে আর যায় না (আমাদের মতো কয়েকটা দেশের কথা অবশ্য আলাদা)। নিজেদের প্রতিযোগিতা নিয়ে সবাই এমন ব্যস্ত থাকে যে, অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর ইচ্ছে বা সময় প্রায় থাকেই না। আমাদের দেশের প্লেয়ারদের দেখেছি, অন্যদের সঙ্গে মেলামেশায় খুব একটা উৎসাহী নয়। ভাষা-সমস্যা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে আগ্রহের অভাব। ওলিম্পিকে আমার অবশ্য কথা বলতে কোনো অসুবিধা হত না। ইংলিশ-মিডিয়ম স্কুলের ছাত্রী বলেই নয়, পাঁচ মাস আমেরিকায় থাকার দরুন ওদের উচ্চারণ, কথার টান চট করে বুঝতে পারতাম।

শুটারদের মধ্যে আমি বয়েসে সবার ছোট। সেজন্য রেঞ্জ-অফিসার থেকে সবাই আমাকে খুব ভালবাসতেন। প্র্যাকটিসে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন তো পড়লাম এক রিপোর্টারের পাল্লায়। সে-ভদ্রলোক রেঞ্জ-অফিসারের কাছে আমার কথা শুনে ইণ্টারভিউ নিতে এসেছেন। ইণ্টারভিউ দেওয়াটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়।

সাত বছর বয়সে মাদ্রাজে ন্যাশনাল শুটিংয়ে প্রথম অংশ নিতে গিয়েছিলাম। সেবার দিয়েছিলাম জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ। এই রিপোর্টার প্রথমেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "ইণ্ডিয়াটা কোথায় ?" প্রশ্ন শুনে আমার এত রাগ হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। পরে ওলিম্পিকের উদ্বোধন দিনে মার্চ-পাস্টের সময় নিজেও অবাক হয়েছি কয়েকটি দেশের নাম শুনে। ওই সব নাম জীবনে কখনও শুনিনি। আমার তো মনে হয়, অনেক স্কুলের ভূগোল-টিচারও সে-সব দেশের নাম বলতে পারবেন না।

এরই মধ্যে একদিন শুটিং-দলের ম্যানেজার এসে বললেন, আমাকে একবার মেডিক্যাল সেন্টারে যেতে হবে। আমি মেয়ে কি না, তা ওঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন। শুনে এত হাসি পেয়েছিল ! এশিয়াডের সময় আমাদের এই পরীক্ষা দিতে হয়নি। আমরা নাম শুনেই টের পেয়ে যাই—কে পুরুষ আর মেয়েই বা কে ? কিন্তু আন্তর্জাতিক খেলা চলার সময় শুধু নামে বোঝা সম্ভব নয়। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তারপর মেয়েদের টুর্নামেণ্টে নামার অনুমতি দেবেন। মেয়েদের টুর্নামেণ্টে বৃহন্নলাবেশী কোনো অর্জুন যাতে না ঢুকে পড়ে, সেজন্য এই ব্যবস্থা। জেতার নেশায় ওজন তুলে আর ওষুধ খেয়ে সেরা মেয়ে-অ্যাথলিটদের শারীরিক কাঠামো এখন প্রায় ছেলেদের মতো পেশীবহুল হয়ে গেছে। মেয়েরাও চুল ছেঁটে ফেলে এখন ছেলেদের পোশাক পরছে। বোঝা মুশকিল—তারা মেয়ে কি না ! লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসে ইভলিন অ্যাশফোর্ডের একটা ছবি দেখেছিলাম। দৌড় শেষ করার ভঙ্গিতে। হাতের পেশীর কাঠিন্য দেখে মনেই হবে না যে, ও মেয়ে। কে বলবে, ইভলিন মেয়েদের মধ্যে বিশ্বে ক্ষিপ্রতমা ?

লাল-সাদা-নীলে লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকের জীবন্ত প্রতীক

সে যাক, মেডিক্যাল সেন্টার থেকে ঘণ্টাখানেক বাদেই ছাড়া পেয়ে গেলাম। ওঁরা আমাকে একটা সার্টিফিকেটও দিলেন। বললেন, "এটা যত্ন করে রেখে দেবে। ভবিষ্যতে বড় কোনো টুর্নামেণ্টে যদি যাও, এটা দেখালে তোমাকে এ-রকম টেস্ট আর দিতে হবে না।"

আমরা যে ভিলেজটায় থাকতাম সেখানে সব মিলিয়ে মেয়ে প্রতিযোগী ছিল প্রায় হাজারের মতো। ফ্যাশন শেখার জন্য চমৎকার জায়গা হতে পারত। নানা দেশের মেয়ে, তাদের নানানরকম ফ্যাশন। অবশ্য, কাউকেই ওখানে ফ্যাশন করতে দেখিনি। একে ভ্যাপসা গরম, তার ওপর প্রতিযোগিতার চিন্তা। সাজগোজের ইচ্ছা কার হবে ? তবে পোশাক পরত বটে জাপান আর কানাডার মেয়েরা। চমৎকার ডিজাইনের স্কার্ট আর ব্লাউজ দেখে লোভ হত আমার। আর চুলের বাহার করতে দেখেছি আমেরিকার কালো মেয়েদের। এবার যে মার্কিন মেয়েটা দৌড়ে তিনটে ওলিম্পিক সোনা পেল, সেই ভ্যালেরি ব্রিসকো হুকসের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিলাম—ওর চুল বাঁধার স্টাইল দেখে। সারা মাথা জুড়ে অন্তত চল্লিশটা ছোট্ট বিনুনি আর কানের দুপাশে ঝুলছে কার্লড দু-গোছা চুল।

ভারী কৌতূহল হয়েছিল ওর চুল দেখে। ওই গিঁট দেওয়া বিনুনিগুলি বাঁধতে কত সময় লাগে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হুকস হেসে বলেছিল, "বেশি নয়, মাত্র ছ' ঘণ্টা।"

"কতদিন পর পর চুল খোলো ?"

ওর উত্তর, "তা, প্রায় দিন-পনেরো বাদে তো বটেই।"

আমেরিকায় যাবার আগে আমার নিজেরও বেশ বড় চুল ছিল। পরে দেখলাম, এটা বাহুল্য। শেষে স্টেপ কাট ছেঁটে নিলাম। এখানে আসার পর এক সংবর্ধনা সভায় ফুটবল কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি আমার চুলের স্টাইল দেখে বলেছিলেন, "যাক, শেষ পর্যন্ত আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো যে লবঙ্গলতিকা হয়ে থাকোনি, এটা সুলক্ষণ। আন্তর্জাতিক স্তরে লড়তে গেলে একটু পুরুষালি হওয়া দরকার।" কী জানি, প্রদীপদাই ঠিক কি না !

ভিলেজের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে-না-হতেই এর মধ্যে ওপেনিং-সেরিমনি এসে গেল। আগের দিন রাত্রিবেলায় খুব টেনশানে ভুগলাম। কেন জানি না, ঘুম আসছিল না। উদ্বোধনের দিন প্র্যাকটিসের বালাই নেই। সকালটা আর কাটে না। টিম-ম্যানেজার এক ফাঁকে এসে বলে গেলেন, বেলা সাড়ে-বারোটার মধ্যে তৈরি হতে হবে সবাইকে। আমরা মেয়েরা পরব লাল সিল্কের শাড়ি। আর নীল ব্লেজার। টেকসাস থেকে সরাসরি লস অ্যাঞ্জেলেসে আসার জন্যে শাড়ি আমি পাইনি। জানতাম, মার্চ-পাস্টে যেতে পারব না। কিন্তু উদ্বোধনের আগের দিন সন্ধ্যায় প্র্যাকটিস সেরে হোস্টেলে ফিরেই দেখলাম, বিছানার ওপর কে যেন পাট-করা শাড়ি রেখে গেছে। অসম্ভব উত্তেজনা সেদিন মনে। মা আমার জন্য কলকাতা থেকে শাড়ির ফলস নিয়ে গিয়েছিলেন। সময় কাটতে চাইছিল না দেখে শাড়ির ফলস লাগাবার কাজে মেতে গেলাম।

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় স্কুলে সেলাই শিখেছিলাম। ভিলেজ মেয়রের দেওয়া সুঁচ-সুতো নিয়ে সেলাই করতে করতে বারবার ভয় পাচ্ছিলাম, শাড়ির উলটোদিকে আবার

ফলস লাগাচ্ছি না তো ! শাড়ির ব্যবস্থা করার পর সমস্যা দাঁড়াল, এটা এখন পরিয়ে দেবে কে ? নিজে কখনও শাড়ি পরিনি। পুজোয় কখনও-সখনও মা শাড়ি পরিয়ে দিতেন। মেয়ে হিসেবে এটা লজ্জারও ব্যাপার। আমার দুরবস্থা দেখে উদ্ধার করতে এল গীতা যুতসি। গোটা-দশেক সেফটিপিন লাগিয়ে আমাকে সাজগোজ করিয়ে দিল। সাড়ে-বারোটার সময় টিমের সবাইকে নিয়ে গ্রুপ ছবি তোলাও হল। ভগীরথকে দেখে খুব মজা লাগছিল। মাথায় রাজস্থানি পাগড়ি। বিরাট গোঁফের জন্য তখন ওকে বাঙালি বলেই চেনা দায়।

আমার খুশি-খুশি মুখ দেখে ও কাছে এসে বলল, "এখন যত পারো হেসে নাও। এরপর কাঁদতে হবে। শুনলাম, কিছু খলিস্তানপন্থী নাকি আমাদের ওপর অ্যাটাক করতে পারে। ওদের অনেকে নাকি এখানে এসেছে।"

শুনেই তো আমার প্রাণ উড়ে গেল। দলের নানাজনে নানা কথা বলছিল। কেউ বলল, ওরা স্টেডিয়ামে দর্শকদের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। আমরা যখন মার্চ-পাস্টের সময় হেঁটে যাব, তখনই গুলি করবে। কেউ বলল, মার্চ-পাস্টের সময় অতটা ঝুঁকি ওরা নেবে বলে মনে হয় না। ওরা অ্যাটাক করবে আমরা যখন কলিসিয়ামের দিকে যাব।

আমাদের ভিলেজ থেকে কলিসিয়াম অর্থাৎ স্টেডিয়াম খুব বেশি দূরে নয়। বাসে করে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। যতক্ষণ না কলিসিয়ামের পাশেই আর একটা ছোট ইনডোর স্টেডিয়ামে ঢুকলাম ততক্ষণ আমাদের বুক দুরদুর করছিল। ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে সব দেশের প্রতিযোগীর বসার ব্যবস্থা সেখানে। 'আই' ব্লকে গিয়ে আমরা বসলাম। স্টেডিয়ামের ভেতরটা আধো-অন্ধকার। ফ্লোরে অনেকে নাচ প্র্যাকটিস করছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাচের শেষ মহড়া সেরে নিচ্ছে। একসময় নাচিয়েরা চলেও গেল। ফ্লোরের ঠিক মাঝখানটায় বিরাট টিভি। তার চার পাশে পর্দা, যাতে স্টেডিয়ামের সবাই দেখতে পায়। টিভির পর্দায় দেখলাম, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে।

আমার কিন্তু একদম ভাল লাগছিল না। এত কাছে কলিসিয়াম, অথচ অনুষ্ঠান দেখতে হচ্ছে টিভিতে।.এশিয়াডের সময় আগে মার্চ-পাস্ট হয়েছিল। তারপর নাচগান। এটাই গেমসের প্রথা। এখানে ঠিক উলটো। আগে নাচগান, তারপর মার্চ-পাস্ট। আমেরিকানরা ট্রাডিশন ভাঙতে পারে বটে ! বিকেল সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ লাউডস্পিকারে আমাদের জানানো হল, এবার কলিসিয়ামে ঢুকতে হবে। আমাদের দলের সামনের লাইনে কর্মকর্তারা, তারপর আমরা ছয় মেয়ে। আমার স্থান হল আবার গ্যালারির দিকে। কলিসিয়ামে ঢোকার সময় আড়চোখে গ্যালারির দিকে তাকাতেই ভয় কেটে গেল। অসম্ভব, খলিস্তানিরা এখানে অন্তত কিছু করতে পারবে না। এটা মনে হতেই প্রচণ্ড খুশিতে মন ভরে উঠল আমার। তারপরই মনে হল, জীবনে এই প্রথম বিরাট একটা কিছু যেন করছি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার আমিও একজন অংশীদার। ভাবতেই গর্বে, আনন্দে বুক ভরে উঠল।

এক একটা দেশ কলিসিয়ামে ঢুকছে, আর গ্যালারিতে বসা তাদের দেশবাসীরা চিৎকার করে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমাদের জন্য কারও উল্লাস নেই। মনেই হল না, গ্যালারিতে

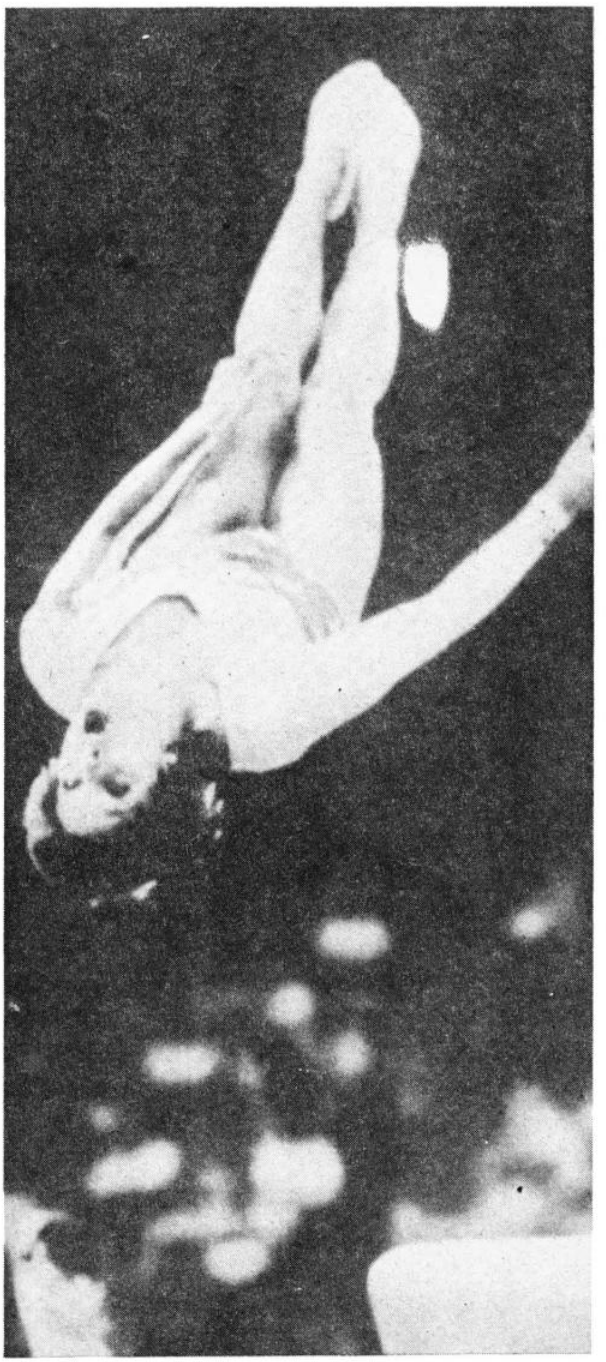

জাদুকরী জিমন্যাস্ট মেরি লু রেটন

ভারতীয় কেউ আছেন। ঘোরের মধ্যে হেঁটে এসে মাঠের মাঝে দাঁড়ালাম। গ্যালারির একপাশে বিরাট টিভি। তাতে দেখলাম, টর্চ নিয়ে দৌড়ে এলেন জেসি ওয়েন্সের নাতনি জিনা হেমফিল। পড়ন্ত বিকেলে পূতাগ্নি জ্বালানোর কায়দা দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দীর্ঘদেহী এক কালো মানুষ জ্বলন্ত মশাল তুলে আলোর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। কলিসিয়ামের একপাশে পূতাধারের ঠিক নীচেই ওলিম্পিকের পঞ্চ বলয়ের একটিতে তিনি মশাল ছোঁয়ালেন। বিদ্যুদ্বেগে সেই আগুন বলয় গ্রাস করে উঠে গেল পূতাধারে। আবেগে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠল। (ক্রমশ)

দুর্গাপুর গার্লস' হাইস্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

শিল্পনগরী দুর্গাপুরের অন্যতম নামী স্কুল দুর্গাপুর গার্লস' হাইস্কুল। দুর্গাপুর ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ড এবং তৎকালীন রাজ্যসরকারের যৌথ সহায়তায় স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৯ সালের ১৯ অক্টোবর। মাত্র কয়েকদিন আগে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২২, এখন ৬১৯। প্রথম প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন অনিলা রায়। এই স্কুলের কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে বনানী দাশচৌধুরী, মৈত্রেয়ী বর্মন, কণিকা বসু, শাশ্বতী ভট্টাচার্য এবং সুচরিতা আচার্যর নাম উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপুর গার্লস' হাইস্কুল থেকে প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় প্রায় ৫০ জন। গত দশ বছরে কেউ ফেল করেনি। জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রতি বছরই থাকে। এবারে পরীক্ষা দিয়েছিল ৯৭ জন, প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২২ জন। দ্বিতীয় বিভাগ ৫২ জন। স্টার পেয়েছে ২ জন।

স্কুলের বর্তমান প্রধানা শিক্ষিকা

শ্রীমতী নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ২০ বছরের। ১৯৬৪ সালে তিনি এই স্কুলে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনামূলক সাহিত্যের এম. এ.। ইংল্যাণ্ডে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেছেন। স্কুলে তিনি ইংরেজি পড়ান।

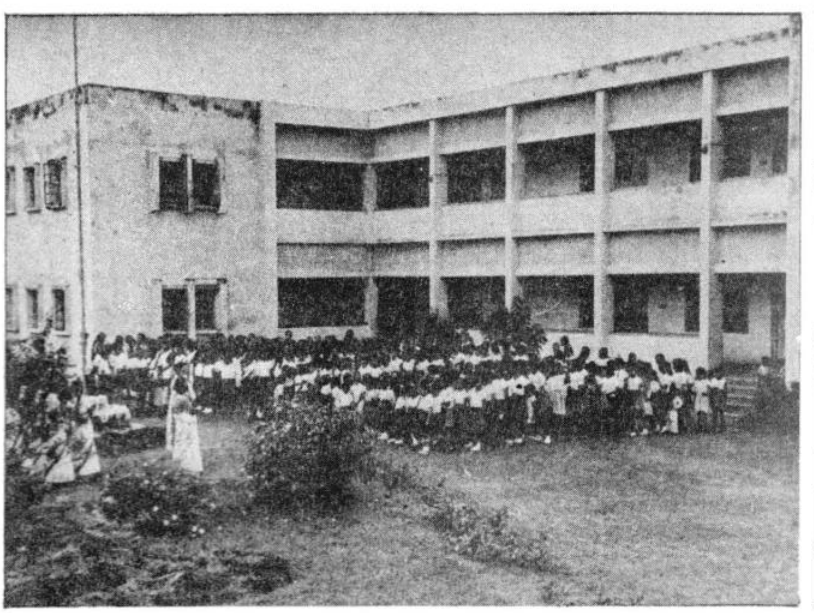

কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানা শিক্ষিকা জানালেন, "নিয়মিত ক্লাসে আসতে হবে। ক্লাস-ফাঁকি দেওয়া একেবারেই চলবে না। পড়াশোনা মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। পাঠ্যবিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। মুখস্থ না করাই ভাল। তবে কেউ যদি মুখস্থ করতে চায়, করুক। কিন্তু বুঝে করতে হবে। না-বুঝে মুখস্থ করার নানা বিপদ। পরীক্ষার সময় সেই বিপদে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা চোখে সর্ষেফুল দেখে, রাম লিখতে শ্যাম লিখে ফেলে। বানান ভুল করে না, এমন ছাত্রছাত্রী পাওয়া দুষ্কর। ভুল যাতে না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। তাড়াতাড়ি এবং নিয়মিত লেখার অভ্যেস করতে হবে। পড়াশোনার সঙ্গে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা যুক্ত করতে পারলে পরীক্ষার ফল যে

"কেউ যদি মুখস্থ করতে চায়, করুক। কিন্তু বুঝে মুখস্থ করতে হবে। না-বুঝে মুখস্থ করার নানা বিপদ।"

★

"জড়ানো, অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা পরীক্ষককে বিরক্ত করে। নিচু ক্লাসে তো বটেই, উঁচু ক্লাসের মেয়েদেরও হাতের লেখা নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত।"

★

"গুরুচণ্ডালী দোষ একটা মারাত্মক ব্যাপার। দোষটা যাতে না-ঘটে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।"

ভাল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

কীভাবে ইংরেজি ও বাংলা পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "সাধারণ স্তরে ইংরেজির মাধ্যমে ইংরেজি লেখা কঠিন ব্যাপার। ইংরেজির ভিত পোক্ত করতে হলে তাই বাংলার সাহায্য নিতে হবে। টেক্সট্ বই যদি ভাল করে পড়া থাকে, তাহলে ভাবনার কিছু নেই। নোটবইয়ের সাহায্য না নেওয়াই ভাল। গ্রামার, ট্রানস্লেশন এবং কম্পোজিশন রপ্ত করতে হলে বাড়িতে নিয়মিত লিখতে এবং পড়তে হবে। জড়ানো, অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা পরীক্ষককে বিরক্ত করে। নিচু ক্লাসে তো বটেই, উঁচু ক্লাসের মেয়েদেরও হাতের লেখা নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত। হাতের লেখা ভাল হলে পরীক্ষক খুশি হন।

"বাংলা বিষয়টিকে যত সোজা আর সহজ মনে হয়, ততটা নয়। ভাল বাংলা লিখতে পারা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। পাঠ্যবই তন্নতন্ন করে পড়তে হবে, সঙ্গে রেফারেন্স বইও। ব্যাকরণ ব্যাপারটা একটু খটোমটো বটে, কিন্তু মন দিয়ে পড়তে পারলে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে না, নম্বরও উঠবে চমৎকার। গুরুচণ্ডালী দোষ একটা মারাত্মক ব্যাপার। দোষটা যাতে না ঘটে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। পত্রপত্রিকা এবং অভিধানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারলে খুব কাজ দেবে।"

অঙ্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "অঙ্ককে ছাত্রছাত্রীরা কেন এত ভয় করে বুঝতে পারি না। অঙ্ক তো বাঘ-ভালুক নয় যে, কামড়ে দেবে। নিয়মিত অনুশীলন করলে এই ভীতি কাটিয়ে ওঠা যায়।"

প্রধানা শিক্ষিকার সামনেই বসে ছিলেন অঙ্কের শিক্ষিকা শ্রীমতী জুঁই সেনগুপ্ত। তিনি প্রধানা শিক্ষিকাকে সমর্থন করে বললেন, "বিষয় হিসেবে অঙ্ক খুবই ভাল। অঙ্কে একটু বেশি সময় দিতে পারলে চমৎকার নম্বর উঠবে। অনেকেই অঙ্ক মুখস্থ করে, এটা মোটেই উচিত নয়।"

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকা জানালেন, "বিজ্ঞানও পুরোপুরি অঙ্কের মতো। মুখস্থ করার বিষয় নয়। বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। বিজ্ঞানের অনেক জিনিস আছে, যেগুলো হাতে-কলমে দেখাতে পারলে উপকার হয়। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বাড়ে।"

ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য : "ইতিহাসকে অনেকেই মনে করে 'মৃত' বিষয়, এটা একেবারেই ভুল ধারণা। ইতিহাস যদি একটু মন দিয়ে পড়া যায়, তহলে বোঝা যাবে, ইতিহাস কত জীবন্ত। ইতিহাসের সাল, তারিখ, ঘটনাপঞ্জি মনে রাখবার জন্য মাঝে-মাঝে মুখস্থ করা দরকার।

"ভূগোলও মুখস্থের বিষয় নয়, জেনে বুঝে লিখতে হবে।"

ভূগোলের শিক্ষিকা শ্রীমতী বন্দনা বসু বললেন, "ভূগোল ম্যাপ-নির্ভর বিষয়। নিয়মিত ম্যাপ আঁকতে হবে। ম্যাপ, চার্ট এবং ডায়াগ্রামের ব্যবহারও শিখতে হবে বেশ ভালভাবে। আর ভূগোল পড়তে হবে সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে।"

কর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রধানা শিক্ষিকার বক্তব্য : "কর্মশিক্ষা বিষয়টি অবহেলা করার মতো নয়। ক্লাসের বাইরে বাড়িতেও এই বিষয়টির প্রতি যত্ন ও মনোযোগ দিলে ভাল নম্বর উঠবে।"

'আনন্দমেলা' সম্পর্কে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত : "ছোটদের আদর্শ কাগজ। শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও এই কাগজ নিয়মিত কাড়াকাড়ি করে পড়েন। আমি এই কাগজ নিয়মিত পড়ি। পড়ে লাভবান হয়েছি।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

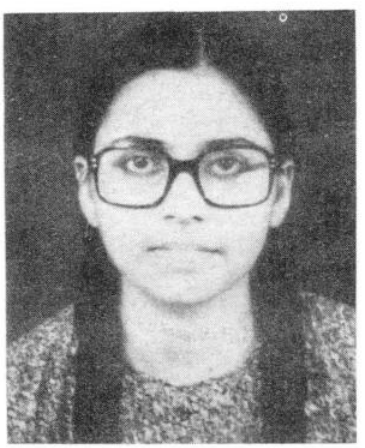

দুর্গাপুর গার্লস' হাইস্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সুস্মিতা সরকার। সুস্মিতা এই স্কুলে নাইন থেকে পড়ছে। আগে পড়ত আসানসোল মণিমেলা গার্লস' হাইস্কুল ও কলকাতার আনন্দআশ্রম সারদা বিদ্যাপীঠে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯৫০ নম্বরের মধ্যে সুস্মিতা পেয়েছিল ৭০৫। সুস্মিতার বাবা শ্রীদীপক সরকার ও মা শ্রীমতী সুদীপ্তা সরকার দুর্গাপুরে চাকরি করেন।

সুস্মিতা সারাদিনে চার ঘন্টা পড়ে। ছুটির দিনে আর-একটু বেশি সময় দেয়। বাড়িতে গৃহশিক্ষক আছেন তিনজন। এঁরা সুস্মিতাকে পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেন। সুস্মিতার বাবা দেখিয়ে দেন অঙ্ক, ভূগোল আর ইংরেজি। ক্লাসে সেকেণ্ড গার্ল মণিদীপা দেব এবং থার্ড গার্ল মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

সুস্মিতা বাংলায় পি· আচার্য, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য-সেনগুপ্তের বই পড়ে। ইংরেজিতে এস. চক্রবর্তী ও এ· সি· সেন, এ. বি. চক্রবর্তীর বই। অঙ্ক : কেশবচন্দ্র নাগ, এ. মাইতি। ইতিহাস : অতুল রায়, প্রভাতাংশু মাইতি। ভূগোল : লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য ও বসু। জীবনবিজ্ঞান : কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, সান্যাল-চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী। ভৌতবিজ্ঞান : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সমর গুহ। পদার্থবিজ্ঞান (ঐচ্ছিক) : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।

গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে সুস্মিতা। আগাথা ক্রিস্টি ও সত্যজিৎ রায় সুস্মিতার প্রিয় লেখক। রবীন্দ্রসংগীত খুব ভাল লাগে। নিজেও শিখছে।

সুস্মিতা ভবিষ্যতে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

'আনন্দমেলা' সুস্মিতার প্রিয় পত্রিকা। কমিক্স পড়তে 'দারুণ লাগে'। 'গাবলু'র কোনো জুড়ি নেই। 'লেখাপড়া' বিভাগ থেকে সুস্মিতা 'অনেক-কিছু জানতে' পেরেছে।

গাবলু

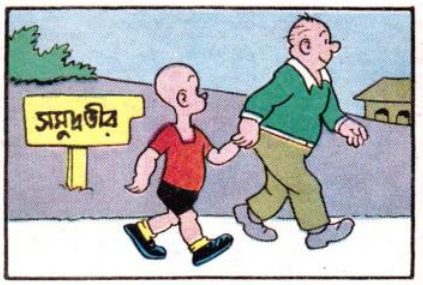
সমুদ্রতীর

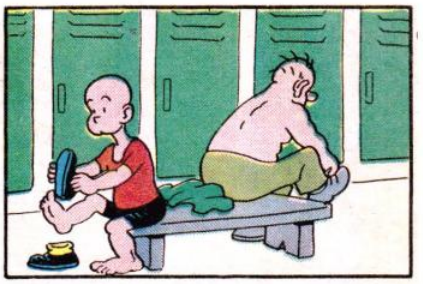

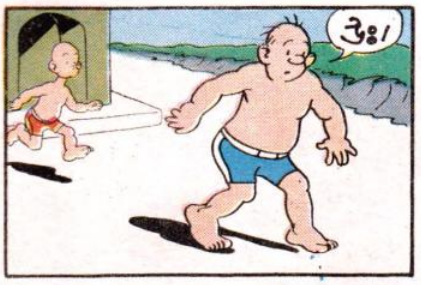
উঃ!

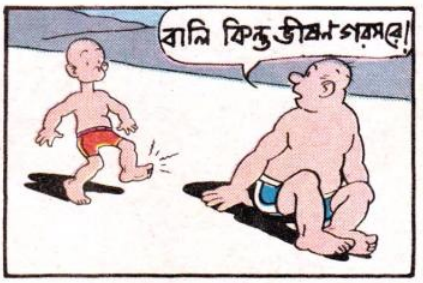
বালি কিন্তু জীবন্ত গরম রে!

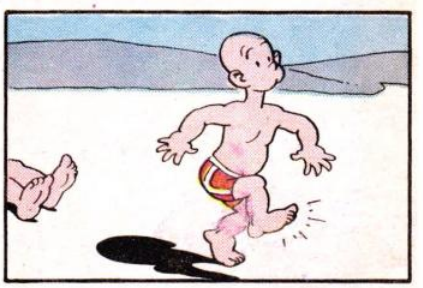

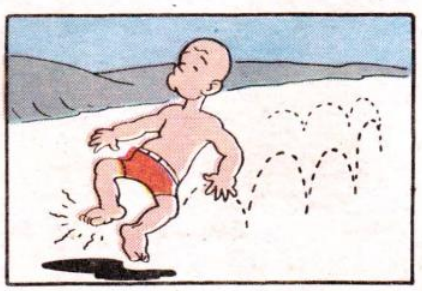

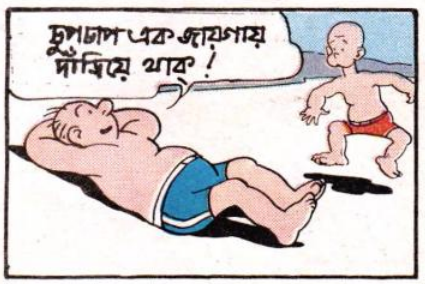
চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক!

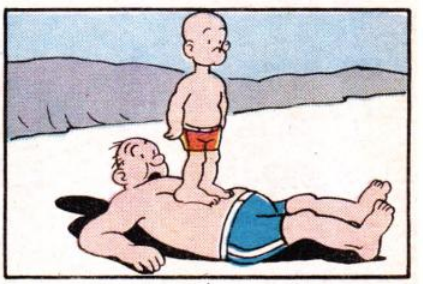

গাবলু

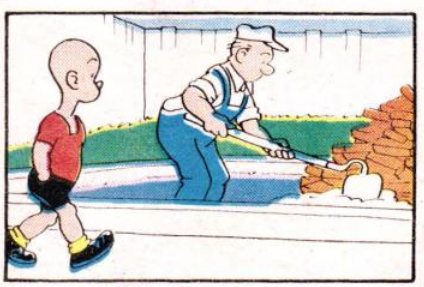

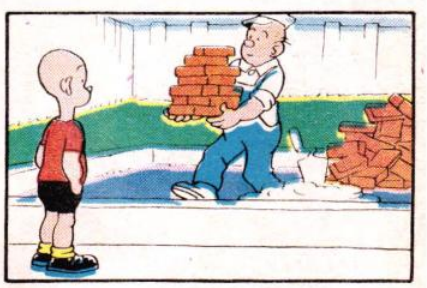

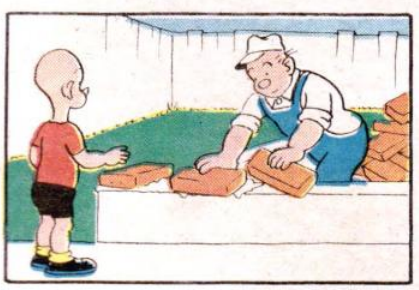

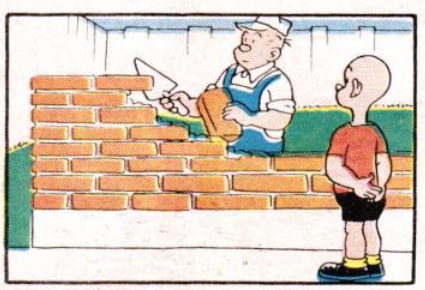

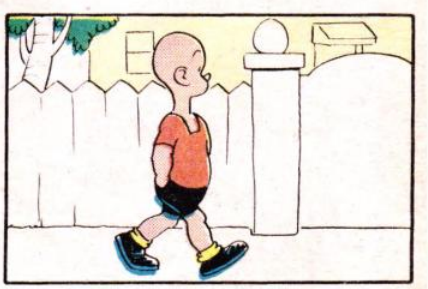

গাবলু, বইগুলোকে ঠিকমত সাজিয়ে রাখা দরকার!

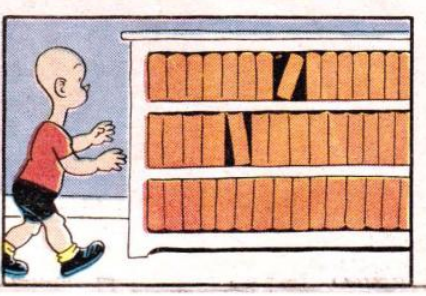

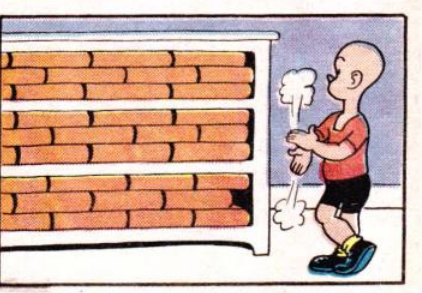

ফ্ল্যাশ গর্ডন

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

এখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু কবি নন, নন শুধু বড়দের প্রিয় কথাকার, ছোটদের মহলেও এখন তাঁর রমরম জনপ্রিয়তা। হবে নাই না কেন, কী সব বুক-তোলপাড়-করা কাহিনীই না তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্যে। শুধু সন্তু আর কাকাবাবুর অভিযানই যদি ধরা যায়, কত-না পটভূমি, কত ধরনের রোমাঞ্চ। 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' থেকে শুরু করে 'সবুজ দ্বীপের রাজা' পেরিয়ে এইসেদিন বই-হয়ে বেরুনো 'খালি জাহাজের রহস্য' পর্যন্ত। তুলনাহীন। আবার, অন্যগ্রহের বাসিন্দাদের নিয়ে 'তিন নম্বর চোখ' ? সেটাও দুর্দান্ত। কেন, 'জলদস্যু' আর 'আঁধার রাতের অতিথি' ? 'ডুংগা', কিংবা 'দিনে ডাকাতি' 'হলদে বাড়ির রহস্য' অথবা 'জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ' ? সত্যি রাজপুত্র ? সত্যি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলব ? আসলে প্রত্যেকটাই ভয়ংকর সুন্দর।

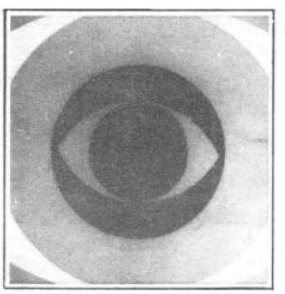
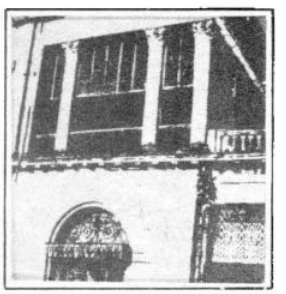

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর-গ্রন্থ-সম্ভার :

ভয়ঙ্কর সুন্দর ১০·০০ সত্যি রাজপুত্র ৮·০০ তিন নম্বর চোখ ৬·০০ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৮·০০ সবুজ দ্বীপের রাজা ৮·০০ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮·০০ ডুংগা ৮·০০ পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক ১০·০০ জলদস্যু ১২·০০ আঁধার রাতের অতিথি ৮·০০ খালি জাহাজের রহস্য ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

এশিয়া কাপের শেষ পর্বে ভারত

অশোক রায়

অন্তত শুরুতে এশিয়া কাপ ঘিরে কলকাতায় উৎসাহ তেমন দানা বাঁধেনি। টেস্ট ম্যাচের সময়ে টিকিট চাওয়ামাত্র যাঁরা নিরুপায়ভাবে মাথা নাড়েন দু'দিকে অথবা ছোট্ট একটি 'সরি' শব্দে নিজস্ব অক্ষমতা জানিয়ে দেন অক্লেশে, আশ্চর্য, তাঁদের অনেকেই এবার দাতাকর্ণ হয়ে দু'হাতে এশিয়া কাপের টিকিট বিলিয়েছেন। তবু প্রথম দিকে মাঠে লোক জমেছে কম। এর পেছনে অবশ্য কারণও ছিল। অষ্টম এশিয়া কাপের তিন নম্বর গ্রুপের বাছাই পর্বের খেলা শুরু হবার আগেই জাপান আর ম্যাকাও নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন খেলা তেমন জমবে না। দ্বিতীয়ত, যাতায়াতের প্রচণ্ড অসুবিধে সামলে অনেকের পক্ষেই সল্টলেক স্টেডিয়ামে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া ছিল শক্ত। তাই ইয়েমেনের বিপক্ষে ভারতের প্রথম ম্যাচে ফাঁকা গ্যালারির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য জুড়েছিলেন এক রসিক দর্শক : 'সবে পুজো গেছে। চুপ্‌সে-যাওয়া মানিব্যাগ পকেটের এককোণে পড়ে আছে আমসত্ত্বের মতো। টিকিট কেটে আসবে কজন ?' সুখের কথা, খেলা যত গড়িয়েছে, কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ তত বেড়েছে। চেনা চিৎকারে ক্রমেই গমগমিয়ে উঠেছে স্টেডিয়াম।

এশিয়া কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু হয়েছিল উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে। চৌষট্টি সালে তেল আভিভে তৃতীয় অনুষ্ঠানে রানার্স হওয়া ছাড়া ভারতের ভাণ্ডার শূন্যই থেকেছে। এবারে চারটি গ্রুপে মোট পঁচিশটি দেশ অংশ নেয়। জাকর্তায় এক নম্বর গ্রুপে প্রথম দুটি স্থান নেয় ইরান এবং সিরিয়া। চিনের গোয়াংজুতে চার নম্বর গ্রুপ থেকে উঠেছে চিন ও কাতার। কলকাতায় তৃতীয় গ্রুপ থেকে উঠল দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারত। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন দু'নম্বর গ্রুপ থেকে কোন্ দুটি দেশ উঠল সেটা অবশ্য তোমরা জেনে যাবে। চারটি গ্রুপ থেকে উঠে আসা আটটি দেশের সঙ্গে থাকবে উদ্যোক্তা সিঙ্গাপুর এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ান কুয়েত। এই দশটি দেশ এশিয়া কাপ দখলের লড়াইতে নামবে ১-১৬ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে।

এবার আসা যাক খেলার কথায়। কলকাতায় ভারত ছাড়া বাকি চারটি দেশ ছিল দক্ষিণ কোরিয়া, মালেশিয়া, পাকিস্তান এবং ইয়েমেন। উদ্বোধনী

সমর্থকদের কোলে অতনু ভট্টাচার্য

ম্যাচেই ইয়েমেনকে ছ গোল দিয়ে দারুণ শুরু করল দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে মালেশিয়া পাঁচ গোল দিল পাকিস্তানকে। প্রথম দুটি ম্যাচেই দুটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রথমত, পাকিস্তানের প্রতিরোধ-ক্ষমতা শূন্যের কাছাকাছি। এবং ইয়েমেন এসেছে বিভাগের শেষ স্থানটির দখল নেবার জন্যেই।

ভারতের হাতে ইয়েমেন চার গোলে চূর্ণ হতেই কলকাতা নড়েচড়ে বসল। সত্তর সালে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পাবার পরে গত চোদ্দ বছর ধরে শুধু অসম্মান এবং হীনম্মন্যতাই মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ভারত। কলকাতার মাটিতে রেকর্ডসংখ্যক গোলে জেতার ফলে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে হঠাৎই একটা উৎসাহ জেগে উঠল। চারপাশের জমাট অন্ধকারের মধ্যে সুদীপ চ্যাটার্জির নেতৃত্বাধীন ভারত যেন ফশ্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ফেলল। ভারত জিতল, কিন্তু দুটি ম্যাচে বারো গোল দেওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কে সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল সকলেই। ফলে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানটি পাওয়া এবং ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার জন্যে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আশায় মালেশিয়া এবং ভারতের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে গেল। এবং অনিবার্যভাবেই গ্রুপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল ভারত-মালেশিয়া ম্যাচটি।

পঞ্চাশ-ষাট হাজার মানুষের চোখের সামনে বৃষ্টি-ভেজা মাঠে একটি পেনাল্টির ধাক্কায় পিছিয়ে গেল ভারত শুরুতেই। এরপরে জিম্ করবেটের কলমে খোঁচা-খাওয়া বাঘের বর্ণনার মতো হিংস্র ফুটবল খেলল ভারত। দুই প্রান্তে গতির ঝড় তুললেন নরিন্দর থাপা এবং বাবু মানি। মাঝখানে নিয়ন্ত্রণের সুতোটি ছিল কৃশানু দের পায়ে। বলতে দ্বিধা নেই, সুরজিতের পরে কৃশানুর পরিশীলিত ফুটবলবোধ দর্শকদের নতুন করে মুগ্ধ করছে। বারের নীচে বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপের জন্যে অতনু ভট্টাচার্য দর্শকদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা নন্দিত হয়েছেন। আর ছিলেন বিকাশ পাঁজি, নির্ভুল যান্ত্রিক-দক্ষতায় গোটা মাঠে যিনি রোবটের মতো বিচরণ করেছেন। নরিন্দরের গোলে সমতা এবং শব্দগর্জনে অনুপ্রাণিত মানির গোলে ভারত জিতল মালেশিয়ার বিপক্ষে। এরপরে কোরিয়া-মালেশিয়া ম্যাচটি ড্র হতেই এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সহজ জয় পেয়ে যাওয়ায় তিন নম্বর গ্রুপ থেকে ভারত এবং কোরিয়ার সিঙ্গাপুর যাত্রায় কোনো বাধা রইল না।

সবই ভাল হল, শুধু শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হারের স্বাদটুকু না পেলেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়া যেত।

সুস্বাস্থ্যের জন্য আসল আয়ুর্বেদিক টনিক এখন নতুন সাজে

বৈদ্যনাথ
চ্যবনপ্রাশ

শক্তি আর পুষ্টির জন্য ৪ ভাবে সমৃদ্ধ

১ ৪৮টি প্রয়োজনীয় এবং অবিষাক্ত গাছ-গাছড়া ও উপাদান দিয়ে তৈরি বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে বছরভোর আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে।

২ সর্দি-কাশি এবং শারীরিক দুর্বলতার মহৌষধ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ। কারণ, একমাত্র এই এই চ্যবনপ্রাশেই আছে ৪টি বিশেষ উপাদান- মকরধ্বজ, অবর্কভস্ম, শৃংভস্ম এবং কেসর।

৩ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ যোগায়। অন্যান্য টনিকের মতো রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নয় বলে এই ভিটামিন ও খনিজ সহজেই শরীরে মিশে যায়।

৪ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষেই উপকারী। বড়দের জন্য প্রতিদিন দু'বার এক চামচ করে চ্যবনপ্রাশ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে, পুষ্টি যোগায় এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দু'বার এক চামচ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ শীতের নানান রোগ বালাই ঠেকিয়ে রাখে।

এখন আধুনিক আকর্ষণীয় পলিপ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে

বৈদ্যনাথ

৫টি আধুনিক কারখানায়
৭০০-রও বেশি
আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে

শ্রী বৈদ্যনাথ
আয়ুর্বেদ ভবন লি:

CLARION C-BNCP-1

আম্পায়ারের খেলা

মণি শর্মা

অধিনায়ক—সেই গাওস্কর। আবার পাকিস্তান সফর। বিরাশি সালের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই। ইমরান ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছিলেন। রাবার হারিয়ে কী দুঃখই না পেয়েছিলাম আমরা ! নেতৃপদ খুইয়েছিলেন গাওস্কর। চুরাশিতে হারানো মুকুট আবার ফিরে পেলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচগুলো হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানে ভারতীয় দল চটপট পৌঁছে গেল সিরিজ খেলবার জন্য। দলপতির চিন্তা ও হাসি নিয়ে বিমান থেকে মাটিতে পা রাখলেন সুনীল মনোহর গাওস্কর। ভারত জুড়ে অনেক আশা, অনেক উত্তেজনা।

টসে জিতে পাকিস্তান ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বল হাতে নিয়ে চেতন শর্মা পাক ব্যাটসম্যানদের ওপর দিব্যি আধিপত্য বিস্তার করে ফেললেন। টেস্ট জীবনের প্রথম ওভারেই চেতন লাভ করলেন মহসিন খানের উইকেট। তারপর আরও দুটি উইকেট নিয়ে উনিশ বছর বয়সী বোলারটি প্রথম দিনের 'হিরো' হয়ে যান। বিপাকে পড়ে জাহির আব্বাস নিজেকে গুটিয়ে নেন। ঠুক ঠুক ঠুক, সারাদিন চরিত্রবিরোধী ব্যাটিং করে গেলেন পাক অধিনায়ক। আমরা গালে হাত দিয়ে বসে অন্য জাহিরকে দেখলাম। বিপদত্রাতার ভূমিকা যথাযথ পালন করে জাহির আব্বাস পাকিস্তানকে চারশোর কোঠায় টেনে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিন খেলার শেষে তিনি যখন প্যাভিলিয়নে ফিরলেন, তখন তাঁর মুখে সুখ এবং তৃপ্তির হাসি। জাহির আব্বাস—১৬৮ নট আউট, দ্বাদশ সেঞ্চুরি।

চোখের সামনে ৪২৮ রান। ভারত ব্যাট করতে নামল। পলক ফেলতে না ফেলতে গায়কোয়ারের প্রত্যাবর্তন। গাওস্কর বড় ইনিংস গড়ার মতো করে খেলছিলেন। সেই স্থিরচিত্ত, শান্ত, ধৈর্যপূর্ণ গাওস্কর। আমরা প্রাণে বল পেয়ে যখন মনে মনে আরও একটি শতরানের গোপন ইচ্ছাকে জায়গা দিতে শুরু করেছি, এমন সময় বজ্রাঘাত। গাওস্কর আউট। ৪৮ রানে। বেংসরকর কিছুটা লড়াই করছিলেন। ৪১ রানে তিনিও গেলেন। পাটিল যেন বেড়াতে এসেছিলেন। ফিরলেন শূন্য হাতে। শাস্ত্রীকে মুড়িয়ে দিলেন আম্পায়ার। কোনো রান করার আগেই। হিসেব ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি শাস্ত্রী। পারিনি আমরাও। অসন্তোষ প্রকাশ করতে তিনি কেবল ঘাড় নেড়েছেন। কপিলদেবের মাঠ ছাড়তে সময় লাগে তিন মিনিট। ক্ষোভ তাঁর মুখ-চোখের রেখায় রেখায় স্পষ্ট। বল তাঁর ব্যাটে লাগার পর প্যাডে লাগে। এবং এত স্পষ্টভাবে লাগে যে, ত্রিশ গজ দূর থেকে তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা

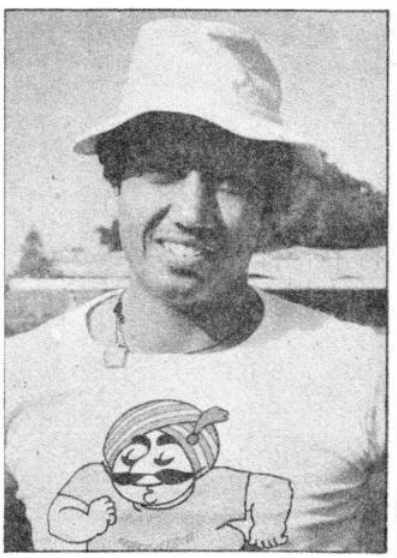

মহিন্দর অমরনাথ

নয়। টিভিতে অন্তত তেমনই দেখিয়েছে। ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপেই লড়াই করছেন মহিন্দর। কিন্তু সে আর কতখানি বিলম্বিত হতে পারে ? ওদিকে বিনি, কিরমানিও খতম। অনেক চেষ্টার পর শেষ উইকেট হিসাবে যখন অমরনাথের পতন হল, ভারতবর্ষ ফলো-অনের লজ্জায় পড়ে গেছে।

ফলো-অন। এই পর্যায়ে পাকিস্তানের পক্ষে সবচাইতে ভাল খেললেন দুই আম্পায়ার। ভাল বললে কম বলা হয়। অবিস্মরণীয় খেলা খেলেছেন। গাওস্করকে প্রথমে ফেরত পাঠ তাঁরা। খিজির হায়াত বুঝেছিলেন, গাওস্কর যেভাবে খেলছেন, বড় ইনিংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দ্রুত তিনি ব্যবস্থা নিলেন কাঁটা দূর করার। করিৎকর্মা হায়াতকে দেখে শাকুর রানা ভাবলেন, আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন। ঘাড়ে কোপ পড়ল গায়কোয়ারের। ষাট রানের মাথায় অংশুমানের পতন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বোধহয় মাথা গরম হয়ে গেল বেংসরকরের। খামোখা অফ-স্টাম্পের বাইরে ব্যাট চালিয়ে তিনি উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। অমরনাথ স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেমেছিলেন। শক্তির শেষ কণাটুকু দিয়ে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে। শাস্ত্রী এগিয়ে এলেন অমরনাথকে সাহায্য করতে। করলেনও বেশ খানিকটা। আম্পায়ার দেখলেন মহা ঝঞ্ঝাট। অভীষ্ট তো সিদ্ধ হয় না। সুতরাং শাস্ত্রীকে ফিরতে হল। তাঁর প্যাডে বল লেগেছিল। শাস্ত্রী নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন। করারই কথা। ৭১ রানের মাথায় এমনভাবে তাড়িয়ে দিলে কার না রাগ হয় ? তারপর গুছিয়ে না বসতেই বিনি এল· বি· ডব্লু·। চোয়াল ঝুলে গিয়েছিল, বিনির পজিশান এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত দেখে। কপিল দেখলেন, এ অবস্থায় ম্যাচ বাঁচানোর চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং খোলা হাতে ব্যাট চালানোই শ্রেয়। ফল—অল্পসময়ে ৩৩ রান। ইতিমধ্যে জাভেদ মিয়াঁদাদের বল স্কোয়ার লেগে পাঠিয়ে মহিন্দর শতরান পূর্ণ করেছেন। শ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞার পুরস্কার। অবিশ্বাস্যভাবে আবার পরিত্যক্ত সিংহাসনে ফিরে এলেন মহিন্দর অমরনাথ, একটি অনুপম সেঞ্চুরি করে। সেঞ্চুরি হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহির ম্যাচ ছেড়ে দেন। কেননা ড্র তখন অবশ্যম্ভাবী। আর ড্র-ই যদি হয়, তবে বৃথা পরিশ্রম করা কেন, এই হল· হাল ছেড়ে দেওয়ার যুক্তি। মহিন্দর ও কপিল যখন ফিরলেন, ভারতের রানসংখ্যা তখন ছয় উইকেটে ৩৭১।

শততম টেস্টে গাওস্করের কাছে আমরা একটি শতরান আশা করেছিলাম। গাওস্কর হয়তো সে আশা পূর্ণ করতে পারতেন। বাদ সাধলেন আম্পায়ার। অনেক চেষ্টা করছি লোকদুটিকে ভুলে যাওয়ার। কিন্তু পারছি না।

গাওস্করের একশো

সুব্রত সিংহ

রেকর্ড গড়া দিয়েই শুরু হয়েছিল সানির টেস্ট-জীবন। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে তাঁর টেস্ট-অভিষেক হয়েছিল। দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্ট-সিরিজেই তিনি যে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছিলেন তা সত্যিই তুলনাহীন। পাঁচ টেস্ট-সিরিজের চারটি টেস্ট খেলে তাঁর সংগ্রহ ছিল ৭৭৪ রান। টেস্ট-আবিভাব সিরিজে এটি একটি রেকর্ড, এবং সেই রেকর্ড আজও অম্লান। তাঁর ওই বিপুলসংখ্যক রানের মধ্যে ছিল চারটি সেঞ্চুরি। একই টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্বও সানি অর্জন করেছিলেন ওই সিরিজেই, পোর্ট অফ স্পেনে পঞ্চম টেস্টে। তার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসেরটি ছিল আবার 'ডবল'। টেস্ট-জীবন শুরু করে প্রথম সিরিজেই একসঙ্গে এতগুলি নজির সৃষ্টি করে বিশ্বক্রিকেটের দরবারে যে প্রতিভার চমক তিনি দেখিয়েছিলেন, আজও তা সমান দীপ্ত।

তেরো বছর আগে তাঁর সাফল্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছিল। আজও তা সচল। একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তিনি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন, বিশ্ব-ক্রিকেটের আসরে যা এখন সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে। অসংখ্য বিশ্বরেকর্ড ও ভারতীয় রেকর্ড আজ সানির দখলে। রেকর্ড ভাঙা-গড়াটা তাঁর কাছে এখন জল-ভাতের মতোই সহজ একটা ব্যাপার।

টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের (৮৩৯৪) রেকর্ড আজ সানিরই দখলে। গতবছর আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর ৯৬তম টেস্টে তিনি ইংল্যাণ্ডের জিওফ বয়কটের ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের (৮১১৪) রেকর্ডটি ডিঙিয়ে যান। একই ক্যালেণ্ডার বছরে চারবার হাজার রান করার কৃতিত্বও সানি দেখিয়েছেন। ছ'টি সিরিজে পাঁচশো রান করার গৌরবও অর্জন করেছেন তিনি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টে তাঁর ডবল সেঞ্চুরি (২৩৬ নঃ আঃ) ক্রিকেটের কিংবদন্তী স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ২৯টি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডটিই শুধু অতিক্রম করেনি, ভেঙে দিয়েছে প্রয়াত ভিনু মাঁকড়ের আঠাশ বছরের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের (২৩১) পুরনো রেকর্ডটিও।

সম্প্রতি সানি আরও একটি সেঞ্চুরি হাঁকালেন। তবে, এবার কিন্তু ব্যাট দিয়ে নয়, স্রেফ মাঠে নেমেই। গত ১৭ অক্টোবর লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলতে নেমেই তিনি প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে একশো টেস্ট খেলার রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। অবশ্য, এদিক থেকে বিশ্বে তিনি চতুর্থ খেলোয়াড়। তাঁর আগে ইংল্যাণ্ডের কলিন কাউড্রে (১১৪), জিওফ বয়কট (১০৮) ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড (১০৬) এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

শুধু একশো টেস্ট খেলেই সানি ভারতীয় রেকর্ড গড়েননি। ওই একই টেস্টে তিনি ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে সর্বাধিক নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ডও গড়লেন। এই টেস্টের আগে মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে ৪০টি টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়ার যুগ্ম রেকর্ড তাঁর ছিল। এছাড়া তিনি একমাত্র ভারতীয় অধিনায়ক, যিনি সব কটি দেশের বিরুদ্ধেই দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেলও একই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

হাতে হাত মেলাচ্ছেন দুই অধিনায়ক—অস্ট্রেলিয়ার হিউজ আর ভারতের সানি

প্রাথমিক চিকিৎসা সংবাদ!

স্পটস্ ও প্যাচেস

কেবলমাত্র ব্যাণ্ড-এড্
এই সুবিধেজনক আকারে পাওয়া যায়

একটি রাউণ্ড
ড্রেসিং যেখানে অন্য
কোনটিই ভাল দেখাবে না

একটি স্কোয়ার
ড্রেসিং যেখানে অন্য
কোনটিই সেঁটে বসবে না

ব্যাণ্ড-এড্

উত্তমভাবে সুরক্ষা প্রদান করে ও দ্রুত উপশম করে

Johnson & Johnson

OBM/3810/BEN

ANANDAMELA 14 NOVEMBER 1991 REGD. NO. WB/CC/264 Mh-BY-SOUTH 683 TN/MS (C)/731

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

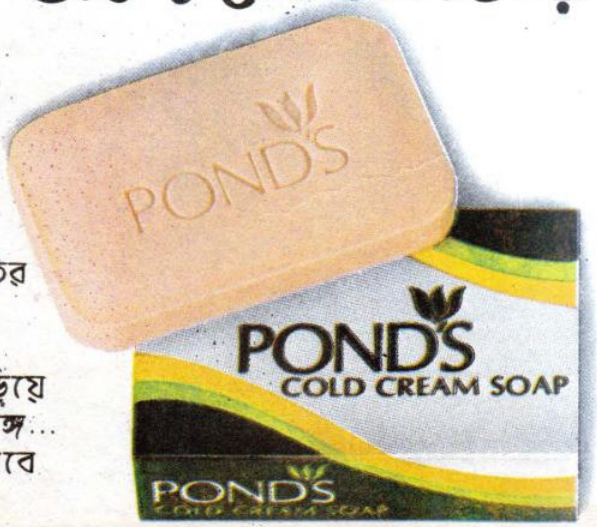

এখন স্নানের পরে এক কোমলতার নতুন অনুভূতির জগতে প্রবেশ করুন। নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে পড়বে আপনার সারা অঙ্গে... আপনার ত্বককে করে তুলবে মোলায়েম ও কোমল।

নতুন

পণ্ডস্

কোল্ড ক্রীম সাবান

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN